আক্রমণ

প্রফুল্ল রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

অরণ্যের কবি বুদ্ধদেব গুহ

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

পূর্বপার্বতী
দায়বন্ধ
প্রান্তর
গ্রামচরিত্র
আমাকে দেখুন ১।২।৩
নিজের সঙ্গে দেখা
আমার নাম বকুল
শঙ্খিনী
রৌদ্রঝলক
সুখের পাখি অনেক দূরে
শীর্ষবিন্দু
একাকী অরণ্যে
নয়না
আলোয় ফেরা
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১।২
আকাশের নীচে মানুষ
স্বর্গের ছবি
সিন্ধুপারের পাখি
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
চতুর্দিক
বাঘবন্দী
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
নোনা জল মিঠে মাটি
প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে

জয়াদের অটো রিকশাটা চক বাজারের মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে চৌরাস্তার মাঝখানে গোল উঁচু মতো ট্রাফিক আইল্যাণ্ড, ওটার মাথায় কংক্রিটের ছাতা। ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে যে পুলিশটা ট্রাফিক কনেট্রাল করছিল, আচমকা সে এদিকে হাত তুলে দিয়েছে।

জয়াদের অটোর পেছনে গাড়ির লম্বা লাইন—অগুণতি বাস, লরি, ট্যাক্সি, অটো, সাইকেল রিকশা, টাঙ্গা, বয়েল এবং ভৈসা গাড়ি। সব সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছে। আড়াআড়ি সামনের রাস্তা দিয়ে এখন গাড়ির স্রোত চলেছে।

এখান থেকে বাঁয়ে, বেশ খানিকটা দূরে মাঝারি পাহাড়ের মাথায় নকীপুরের নতুন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। অসংখ্য চিমনি আকাশের দিকে মাথা তুলে গল-গল করে ধোঁয়া ছাড়ছে অনবরত। আবছাভাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের হাউসিং কমপ্লেক্সের হাজার হাজার বাড়িঘর চোখে পড়ছে। ডান দিকে যে পাহাড়ী রেঞ্জটা রয়েছে সেটা কোল মাইন এরিয়া- মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু কয়লার খনি।

রাস্তার মাঝখানে কুড়ি-পঁচিশ ফুটের মতো জায়গায় পীচের আস্তর, তারপর দু'ধারেই খোয়া ফেলা হয়েছে। কবে রোড রোলার এনে এগুলো সমান করে পীচ দিয়ে মুড়ে ফেলা হবে, নকীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অযোধ্যাপ্রসাদ জি ছাড়া আর কেউ জানে না।

দু'পাশে খোয়া যেখানে শেষ হয়েছে তারপর খোলা নর্দমা, এগুলো কোটি কোটি এনোফিলিস মশা মেটার্নিটি হোম।

রাস্তায় গাড়িটাড়ি ছাড়া, যেদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। দেশে 'পপুলেসন এক্সপ্লোসান' বা জন-বিস্ফোরণ কী হারে ঘটেছে, বিহারের এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-কাম-কোল মাইন শহরে এলে খানিকটা টের পাওয়া যায়।

এখন বারোটার মতো বাজে। দূরের পাহাড়ী রেঞ্জের মাথা টপকে হু-হু করে উল্টোপাল্টা ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ছুটে আসছে।

জুনের আধাআধি কেটে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই মনসুন শুরু হয়ে যাবে। জলকণাবাহী বাতাসে তারই আভাস। আকাশ জুড়ে টুকরো টুকরো এলোমেলো মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। আকাশের মেঘ, ভরদুপুরে নকীপুর শহরের গমগমে চেহারা কিংবা চারদিকের লোকজন, গাড়িটাড়ি, কিছুই দেখছিল না জয়া। তাকে খুবই [illegible] এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

জয়ার বয়স তেইশ চব্বিশ। তার রং ফর্সাও না, আবার কালোও না—দুইয়ের মাঝামাঝি। মুখ লম্বাটে, অনেকটা ডিম্বাকৃতি। চেহারায় টান টান সতেজ একটা ভাব আছে। আর যা আছে তা হল এক ধরনের ঋজুতা যাকে ব্যক্তিত্বই বলা যায়।

এই মুহূর্তে তার পরনের শাড়ি কিছুটা অগোছাল, চুল উস্কখুস্ক। বোঝাই যায়, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সাজ-পোশাকের দিকে তার আদৌ লক্ষ্য ছিল না, যদিও উৎকটভাবে না হলেও পরিপাটি করে সাজতে সে ভালবাসে।

জয়ার ডান পাশে বসে আছেন তার বাবা মহীতোষ—মহীতোষ চৌধুরী। ষাটের কাছাকাছি বয়স। তিনি যে জয়ার বাবা, মুখের [illegible] দেখেই আন্দাজ করা যায়। তবে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, চামড়া [illegible] চুলের বেশির ভাগটাই সাদা ধবধবে একসময় গায়ের রং [illegible] টকটকে, এখন অবশ্য জ্বলে তামাটে। তবু শক্ত মেরুদণ্ড, মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে, চওড়া কপালে এবং ধারাল থুতনিতে এক ধরনের অনমনীয়তা রয়েছে। দেখামাত্রই বোঝা যায়, মানুষটি মারাত্মক জেদী এবং একরোখা।

মহীতোষের পরনে এখন ঢলঢলে সস্তা কটনের ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। পোশাকটা একসময় চমৎকার ফিট করত, শরীর ভেঙে যাওয়ায় বেমানান দেখায়। যেন কোন স্বাস্থ্যবান লোকের শার্টটার্ট পরেছেন।

জয়ার উদ্বিগ্ন চোখ ঘুরে ঘুরেই বাবার ওপর এসে পড়ছিল। ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল পেলেই তাদের অটো কোমরে একটা মোচড় দিয়ে ডাইনে ঘুরে নকীপুরের এক নম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে পৌঁছে যাবে। তাতে সময় লাগবে বড় জোর মিনিট দশেক। নিজের হৃৎপিণ্ডে ঢাকের আওয়াজ শুনতে লাগল জয়া।

আগেও অনেক বার মহীতোষকে যা বলেছে, আরো একবার তা-ই বলার জন্য আস্তে করে ডাকল, 'বাবা—'

অন্যমনস্কর মতো কিছু ভাবছিলেন মহীতোষ। একটু চমকে উঠে বললেন, 'কী বলছিস?'

'এখনও ভেবে দেখ বাবা, কোর্টে যাবে কিনা। শুধু শুধু বিপদ ডেকে আনার কী দরকার!'

মহীতোষ উত্তর দিলেন না। জয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালেন।

জয়া এবার বলল, 'অটোওলাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলব?'

মহীতোষের মুখে কাঠিন্য দেখা দিল। গলার স্বরে একটু জোর দিয়েই বললেন, 'না।'

জয়ার চোখে হতাশা ফুটে উঠল। বাবা কী বলতেন, সে জানে। তবু ক'দিন ধরে সে ক্রমাগত বুঝিয়ে আসছে যদি বাবা তার কথায় রাজী হন।

আসলে মহীতোষ যাচ্ছেন একটা ক্রিমিন্যাল কেসে সাক্ষ্য দিতে। তিনিই এই মামলার প্রধান সাক্ষী।

এই কেসের আগে নকীপুর সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। দেশ স্বাধীন হবার আগে বিহারের এই শহরটা ছিল খুবই ছোট—শান্ত এবং নিরিবিলি। পুজোর পর বা গরমের ছুটিতে কলকাতা থেকে অনেকে এখানে হাওয়া বদল করতে আসত। পয়সাওলা লোকেরা কেউ কেউ এখানে বাংলোও বানিয়ে নিয়েছিল। ডান দিকে পাহাড়ের ঢালে দু-একটা কয়লাখনি যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু সে সব

ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আদিবাসীরা কয়লা খাদানে কাজ-টাজ করত, থাকত ওখানেই ঝোপড়ি বানিয়ে। নকীপুরের যেদিকটা ভদ্রলোকদের জন্য সংরক্ষিত, ক্বচিৎ সেদিকে তারা আসত। নকীপুরের শান্তি ছিল একেবারেই অবাধ এবং নির্বিঘ্ন।

স্বাধীনতার পর বিহারের এই শহরের চেহারা এবং চরিত্র একেবারেই পাল্টে যেতে লাগল। প্ল্যানিং কমিশন, জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের নেক নজর এসে পড়ল জায়গাটার ওপর। নকীপুরের পোটেনসিয়ালিটি নাকি বিপুল।

কাজেই ঝাঁকে ঝাঁকে শিল্পপতিরা এখানে এসে কারখানার পর কারখানা বসাতে লাগল। আসতে লাগল ঠিকাদারদের লোকেরা, তাদের সঙ্গে লম্বা লম্বা ক্রেন, বুলডোজার আর অগুণতি জীপ! আকাশের দিকে মাথা তুলতে লাগল শ'য়ে শ'য়ে চিমনি।

ডান দিকে যে পাশে কয়লা খাদান, জিওলজিক্যাল সার্ভের লোকেরা সেখানে মাটিতে নানা রকম যন্ত্রপাতি বসিয়ে খোঁজ পেল, আরো নাকি কয়েক শ কোটি টন কয়লা মজুত রয়েছে এখানে। কাজেই খনির পর খনির কাজ শুরু হয়ে গেল।

প্রাইভেট সেক্টরের ইণ্ডাস্ট্রিই শুধু বসল না, পাবলিক সেক্টর থেকেও হেভি ইণ্ডাস্ট্রির বিশাল বিশাল কারখানা বসাতে লাগল। ইস্টার্ন রেলওয়ে এখানে বসিয়ে দিল একটা ডিভিসন। জালের মতো অসংখ্য রেল লাইন পেতে জায়গাটাকে ছেয়ে ফেলা হল। গভর্নমেন্ট থেকে কয়েক হাজার গোডাউন বানানো হল। সেখানে থাকে নানা ধরনের কেমিক্যালস, ফুড গ্রেন, দামী দামী যন্ত্রপাতি, ওষুধ, এমনি কত রকমের যে জিনিস।

এমন সব কাণ্ডকারখানা যেখানে চলছে সেখানে মানুষ ত আসবেই। চারপাশের গাঁ-গঞ্জ উজাড় করে লোক আসতে লাগল হুড় হুড় করে—বর্ষার প্রবল জলস্রোতের মতো। শুধু কি চারপাশের মানুষজন, কাজের আশায় মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংলা, ওড়িশা, অন্ধ্র—ভারতবর্ষের

নানা প্রভিন্স থেকে অবিরাম মানুষ আসছে ত আসছেই।

যেখানে হাওয়ায় কোটি কোটি টাকা উড়ছে সেখানে ঝাঁক বেঁধে ক্রিমিন্যালরা ত আসবেই। কোল মাইনের মাফিয়ারা আগে থেকেই ছিল। রোজ রাতে কয়েক শ টন করে কয়লা রেলওয়ে সাইডিং থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া নেপাল থেকে প্রচুর ফরেন জিনিস— জামাকাপড়, ট্রানজিস্টর, টিভি, টেপ-রেকর্ডার, ঘড়ি, নানারকম ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট—রাতের অন্ধকারে প্রথমে আসে নকীপুর, তারপর এখান থেকে গোটা ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। জায়গাটা মাফিয়া আর স্মাগলারদের প্যারাডাইস।

মাফিয়াদের অন্তত চার পাঁচটা বিরাট গ্যাং রয়েছে নকীপুরে। আর স্মাগলার যে কত তার ঠিকঠিকানা নেই। তাদের মধ্যে মারামারি এবং খুনোখুনি আকছার লেগেই আছে। এমন একটা দিন নেই যেদিন নকীপুরে কম করে ছুটো মার্ডার আর চারটে ছুরি মারার ঘটনা ঘটে না। তা ছাড়া রাত্তিরে নানা এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাংগুলোর মধ্যে নিয়মিত দু-তিন ঘণ্টা বোমাবাজি ত আছেই।

মাফিয়া এবং স্মাগলারদের চামড়ায় আঁচড় কাটার দুঃসাহস নকীপুরে কারো নেই অনেকের ধারণা পুলিশের একটা অংশ আর কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তারা রীতিমত আঁতাত করে ফেলেছে, ফলে পলিটিক্যাল এবং পুলিশ প্রোটেকসান পেয়ে যাচ্ছে। মাফিয়া, স্মাগলার, এক জগতের কোরাপ্ট পুলিশ আর পলিটিসিয়ান, মার্ডার, স্ট্যাবিং—সব মিলিয়ে নকীপুরে নরক একেবারে জমজমাট। এখানকার ক্রাইম রেট বা অপরাধের হার খুব সম্ভব সারা দেশের মধ্যে সব চাইতে বেশি।

মাসখানেক আগে এখানে মার্ডারটা হঠাৎ এত বেড়ে যায় যে খবরের কাগজে প্রচুর হৈচৈ হয়। ফলে স্টেট ক্যাপিটাল অর্থাৎ পাটনার টনক নড়ে যায়। সেখান থেকে এখানকার পুলিশকে কড়া এবং জরুরী নির্দেশ পাঠানো হয়—যেভাবেই হোক শক্ত হাতে ক্রিমিন্যালদের

শায়েস্তা করতেই হবে। নকীপুরের ক্রাইম বন্ধ করতে হলে যা যা দরকার তা-ই যেন করা হয়। পাটনার অ্যাডমিনিস্ট্রেসন এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য করবে।

তারপরই নকীপুরের পুলিশ নড়েচড়ে ওঠে। কোমরে বেল্ট এঁটে তারা নেমে পড়ে রাস্তায়। নানা জায়গায় হানা দিয়ে বেশ কিছু অ্যারেস্টও করে ফেলে। লোকের বিশ্বাস, যাদের ধরা হয়েছে তারা রদ্দি টাইপের স্মাগলার বা মাফিয়া গ্যাংয়ের লোক। যারা এখানকার ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের নাটের গুরু, পুলিশ তাদের ধারে কাছে ঘেঁষেনি। নকীপুরের অন্ধকার জগতের সুপারস্টারেরা বহাল তবিয়তেই রয়েছে, তাদের ঘুমে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি।

মাসখানেক আগে মার্ডার রেট হঠাৎ বেড়ে যাবার সময় একটা চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। ভানুপ্রতাপ সহায় নামে এখানকার এক প্রাইভেট কোম্পানির অ্যাকাউন্টেন্ট খুন হন।

এতদিন মার্ডার টার্ডার যা হতো তা স্মাগলার বা মাফিয়া গ্যাংয়ের লোকেদের মধ্যে। এই প্রথম আণ্ডারওয়ার্ল্ডের বাইরের একটি মানুষ খুন হলেন।

ভানুপ্রতাপ ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে নিরীহ ধরনের মানুষ, কখনও কারো সাতে-পাঁচে থাকতেন না। অফিস এবং বাড়ির মধ্যেই ছিল তাঁর জগৎ। তবে ধর্ম কর্মের দিকে খানিকটা ঝোঁক ছিল। ছুটির দিনে সস্ত্রীক স্থানীয় রামদাতা মন্দিরে ভজন বা গীতাপাঠ শুনতে যেতেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

ভানুপ্রতাপের খুনের ফলে নকীপুরে প্রচণ্ড ভয় আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার মানুষজন নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকে। প্রতিবাদ হিসেবে স্কুল কলেজে একদিন স্ট্রাইক হয়, আরেক দিন গোটা নকীপুরেই শান্তিপূর্ণ বন্ধ্ ডাকা হয়। এখানকার ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট নাগরিকেরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সামনে গিয়ে খুনীদের ধরার জন্য পুরো বারো ঘন্টা ধর্না দিয়ে একটা স্মারকলিপিও

নেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। মহীতোষ রাজা হন নি। যে কারণে অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর রাজনীতিতে আসা সেটা যখন পাওয়াই গেছে তখন আর রাজনীতি করার ইচ্ছা ছিল না। একটা দামী সরকারী পোস্ট দেশপ্রেমের দাম হতে পারে না। মহীতোষ দিল্লীকে বুঝিয়ে এসেছেন, প্রশাসন চালাবার যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা কোনটাই তাঁর নেই। এ জন্য দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যেন খোঁজ করে তাঁদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নকীপুরে ফিরে এসে চুপচাপ বসে থাকেন নি মহীতোষ। কট্টর রাজনীতি ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক কিছুই করার আছে। তিনি সোসাল ওয়ার্কটাই বেছে নিয়েছিলেন। নানা জায়গায় ছোটাছুটি করে, এমন কি নিজেও প্রচুর টাকাপয়সা এবং জমি টমি দিয়ে স্কুল কলেজ হাসপাতাল বসিয়েছেন। কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কার মড়া পোড়াবার পয়সা নেই, একমাত্র রোজগেরে লোকটি মরে যাবার ফলে কোন সংসার ভেসে যেতে বসেছে—এমন সব জায়গাতেই মহীতোষ।

স্বাধীনতার পর প্রথম যেবার প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় তখন তাঁকে লোকসভার টিকেট দিতে চাওয়া হয়েছিল। দেশগঠনে তাঁর মতো সৎ নিঃস্বার্থ মানুষের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এবারও রাজী হন নি মহীতোষ। দিল্লী এবং পাটনা থেকে অনেকে এসে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, মহীতোষ সবিনয়ে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। মহীতোষ বলেছেন, যা তিনি করছেন সেটাও দেশসেবাই। এই অঞ্চলের মানুষের বিন্দুমাত্র উন্নয়নও যদি তাঁর সাহায্যে হয় তাতেই তিনি তৃপ্ত। পার্লামেন্ট সদস্য হবার চাইতে সেটা তাঁর কাছে অনেক বড় ব্যাপার।

জমিদারি বিলোপের সময় মহীতোষ এমন একটা কাণ্ড করলেন যাতে তাঁর সম্পর্কে এই অঞ্চলের মানুষের শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় হাজার গুণ বেড়ে গেল। তাঁর ঠাকুরদা এবং তাঁর বাবা যে কয়েক শ একর জমি জলের দামে কিনে নিয়েছিলেন তা ভূমিহীন মানুষদের দানপত্র করে

বিলিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ে তাঁর স্ত্রীর বেশ আপত্তি ছিল, তিনি বাধা দিতেও চেয়েছিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা এসে তাঁকে ঝোঁকের মাথায় এ জাতীয় হঠকারিতা করতে বার বার বারণ করেছে। কিন্তু কারো কথা তিনি শোনেন নি। মহীতোষ খুবই একগুঁয়ে ধরনের মানুষ। যা তিনি বিশ্বাস করেন, একবার যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও সেখান থেকে তাঁকে টলানো অসম্ভব। তিনি স্ত্রী এবং বন্ধুবান্ধবকে বুঝিয়েছেন, তাঁকে বাড়িভাড়া দিতে হয় না, কোম্পানির শেয়ার থেকে যে ডিভিডেণ্ড পান তাও খরচ করে শেষ করা যায় না। তাঁদের যে বাড়তি জমিজমা রয়েছে সেগুলো বিলিয়ে দিলে যদি কয়েক শ মানুষ বেঁচে যায় তাতে বাধা দেবার বা আপত্তি জানাবার কোন মানে হয় না। এর পর থেকেই নকীপুরের মানুষের কাছে তাঁর ইমেজ প্রায় ঈশ্বরের মতো: শ্রদ্ধা ভক্তি বিস্ময়—সব মিলিয়ে মহীতোষকে সবাই মনের ভেতর আকাশ-সমান উঁচু একটা বেদিতে বসিয়ে রেখেছে কত কাল ধরে। তাঁকে নিয়ে এখানে অজস্র মিথ, অসংখ্য কিংবদন্তী।

আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর এখানে প্রচুর কল-কারখানা বসতে শুরু করেছিল, একটার পর একটা কয়লা খনি খোলা হচ্ছিল। কাজের খোঁজে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে যে হাজার হাজার মানুষ হুড় হুড় করে চলে আসছিল তাদের মধ্যে ছিল বুটলেগার স্মাগলার মাফিয়া, এমনি সব অ্যান্টিসোসালেরা নকীপুরের সাধারণ মানুষ, কলকারখানার শ্রমিক এবং অফিসের কর্মীরা ত মহীতোষকে শ্রদ্ধা করেই, অ্যান্টিসোসালদের মধ্যেও তাঁর সম্বন্ধে রীতিমত সম্ভ্রমই রয়েছে। অবশ্য তারা মহীতোষের কাছে আসে না. একটা দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের নিয়েই থাকে।

এইভাবেই চলে আসছিল। হঠাৎ ভানুপ্রতাপ সহায় খুন হয়ে যাওয়ায় সব ওলটপালট হয়ে গেল।

যেদিন মহিতোষ কোর্টকে জানালেন, ভানুপ্রতাপ হত্যার মামলায় সাক্ষী হবেন সেই দিনই সন্ধেবেলায় এক ফোন এল
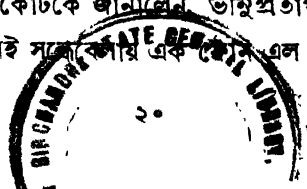
জমা দিয়ে এসেছেন। এই প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহীতোষ চৌধুরী।

এই সব হৈচৈ এবং আন্দোলনের কিছু ফলও হয়েছে। তিনটি লোককে খুনের সন্দেহে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। পুলিশ তাদের নামে মার্ডার কেস এনে আদালতে মামলাও এনেছে।

মামলাটা কতদূর গড়াবে, অপরাধীরা শাস্তি পেত কি পেত না—সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। কেননা শুধু মার্ডার চার্জ আনলেই তো হয় না, কোর্টে সাক্ষী-টাক্ষী এনে সারকামসটেনসিয়াল এভিডেন্স জোগাড় করে তা প্রমাণও করতে হবে।

এই কেসে দু'জন সাক্ষী অবশ্য পাওয়া গেছে। তাদের একজন রেলের গ্যাংম্যান, আরেক জন একটা ফ্যাক্টরির সুইপার। ঘটনার সময় তারা নাকি কাছাকাছিই ছিল। তবে দু'জনেই প্রচণ্ড মাতাল। খুনের সময় তাদের গলা পর্যন্ত চিল্ড তাড়িতে ঠাসা, পরে পুলিশ তাদের পাকস্থলীতে পাম্প করে সেই তাড়ি বার করে। এই দুই নেশাখোর জেরার মুখে পড়লে দু'মিনিটও দাঁড়াতে পারবে না। খবর পাওয়া গেছে, আসামী পক্ষ নকীপুরের সব চাইতে দামী ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার রাঘব ঘোষালকে খাড়া করিয়েছে। সমনে গলায় তিন বার ধমক, সাত বার হুঙ্কার ছেড়ে ঘোষাল প্রমাণ করে দেবেন, গ্যাংম্যান আর সুইপার নেশার ঘোরে কী দেখতে কী দেখেছে। তিন তুড়ি মেরে তিনি আসামীদের বেকসুর খালাস করিয়ে আনবেন।

কিন্তু এই কেসের সব চাইতে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হল তিন নম্বর সাক্ষীর নাম। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মহীতোষ চৌধুরী। তাঁর নামটা মার্ডার কেসের সঙ্গে জড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা নকীপুর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। স্কুল কলেজ অফিস ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ এবং মহল্লায় মহল্লায় একই আলোচনা। গোটা শহর জুড়ে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এই উত্তেজনার কারণ রয়েছে যথেষ্ট।

কেননা নকীপুর শহরের সব চাইতে শ্রদ্ধেয় মানুষ মহীতোষ চৌধুরী সৎ ঋজু এবং আদর্শবান।

মহীতোষ চৌধুরী সম্পর্কে কিছু বলার আগে তাঁর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা দরকার।

প্রায় একশ বছর অর্থাৎ পাঁচ জেনারেসন ধরে নকীপুরে আছেন মহীতোষরা। ইংরেজ আমলে তাঁর ঠাকুরদার বাবা এখানে জঙ্গল ইজারা নিয়ে আসেন। তাঁর ছিল টিম্বারের বিজনেস।

বন ইজারা দেবার পেছনে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের একটা বিরাট উদ্দেশ্য ছিল। জিওলজিস্টরা সার্ভে চালিয়ে জানতে পেরেছিল, এখানে মাটির তলায় যে কোটি কোটি টন কয়লা মজুত রয়েছে দু-তিন শ বছরেও তা ফুরোবে না।

ইংরেজদের উদ্দেশ্য, জঙ্গল সাফ করে এখানে শহর এবং কয়লা-খনি বসানো।

এখনকার গমগমে জমজমাট নকীপুরকে দেখলে একশ বছর আগের নকীপুরের কথা কল্পনাও করা যাবে না। তখন এটা ছিল জঙ্গলে-ঘেরা একটা নিঝুম দেহাত। সামান্য কিছু সাঁওতাল আর ওরাওঁ আদিবাসী ছাড়া এখানে আর বিশেষ মানুষজন ছিল না। তবু ভূগোলের হট্টগোল থেকে অনেক দূরে এই নিরিবিলি নির্জন জায়গাটা দারুণ ভাল লেগেছিল ঠাকুরদার বাবার। মানুষটা ছিলেন ঘোর বৈষয়িক এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নকীপুর চিরদিন এরকম থাকবে না বিরাট শহর এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হয়ে উঠবে।

এখানে প্রথম প্রথম তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন ঠাকুরদার বাবা আর জঙ্গল কেটে কাঠ পাঠাতেন কলকাতায়। কাঠের ব্যবসাতে হুড়হুড় করে টাকা আসতে লাগল তাঁর হাতে। সেই টাকার একটা অংশ দিয়ে একরের পর একর জমি কিনতে লাগলেন। তখন এখানে জলের দরে জমি বিকোতো। বাকি টাকাটা কলকাতার বড় বড় কোম্পানির শেয়ারে ইনভেস্ট করতেন।

বছর কয়েক তাঁবুতে কাটাবার পর বিরাট বাড়ি বানিয়ে কলকাতা থেকে ফ্যামিলি নিয়ে এসেছিলেন ঠাকুরদার বাবা।

মহীতোষের ঠাকুরদা তাঁর ধাতটা পুরোপুরিই পেয়েছিলেন। বাবার মতই ব্যবসা ট্যবসাতে তাঁর মাথা দুর্দান্ত খুলত। পারিবারিক টিম্বার বিজনেসকে তিনি যেমন কয়েক গুণ বাড়িয়েছিলেন, তেমনি জমিজমাও বাড়িয়েছিলেন অজস্র: শুধু শহরের জমিজমাই নয়, চারপাশের চাষের জমিও কিনেছিলেন হেক্টরের পর হেক্টর।

কিন্তু থার্ড জেনারেসন অর্থাৎ মহীতোষের বাবা উষানাথের আমলে এসে ব্যাপারটা আর আগের মতো রইল না। পারিবারিক ব্যবসা ট্যবসা বা ল্যাণ্ড প্রপার্টি বাড়াবার দিকে একেবারেই ঝোঁক ছিল না তাঁর। উষানাথ যখন কিশোর তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশ তোলপাড় হয়ে গেছে। যখন সবে যৌবনে পা দিয়েছেন, গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে চলে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। দিকে দিকে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন। তার কোনটা টেররিস্ট মুভমেণ্ট, কোনটা বা গান্ধীজির ডাকে অহিংস সংগ্রাম।

গোটা দেশ উথাল-পাথল হয়ে যাচ্ছে। উষানাথ জমি জমা, বিষয় সম্পত্তি আর টিম্বারের বিরাট ব্যবসার পয়সায় সোনার খাটে শুয়ে পা নাচিয়ে নাচিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ওসব ব্যাপারে তাঁর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। অস্থির ভারতবর্ষ পারিবারিক ট্রাডিসান থেকে তাঁকে একটানে তুলে নিয়ে দেশজোড়া প্রবল স্রোতের মধ্যে যেন ছুঁড়ে দিয়েছিল। গান্ধীজি যখন নন-কো-অপারেসনের ডাক দিলেন তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারেন নি উষানাথ। অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্টও হলেন এবং তাঁকে জেলেও যেতে হল। নকীপুরের তিনিই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি ইংরেজের জেল খেটেছিলেন। তারপর যত বার আন্দোলন হয়েছে তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের নেতা। বার বার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত খুব কম বয়েসে জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহীতোষ তাঁর বাবার দেশপ্রেম এবং সংগ্রামের উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন। পারিবারিক টিম্বার বিজনেস উষানাথের আমলেই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মহীতোষের সময়ে সেটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তবে জমিজমা এবং কোম্পানির শেয়ার থেকে যে ইনকাম হত তাও যথেষ্ট, তাঁদের পরিবারের তুলনায় ঢের বেশি।

বেয়াল্লিশে 'কুইট ইণ্ডিয়া'র যে ডাক দেওয়া হয়েছিল তাতে বিহারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত জ্বলে গিয়েছিল। বিপ্লবীরা রেলের লাইন আর টেলিগ্রাফের তার উপড়ে, রাস্তা খুঁড়ে ব্রিজ ভেঙে সমস্ত যোগাযোগ সিস্টেম তছনছ করে দিয়েছিল। ইংরেজের পুলিশও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে নি, বেপরোয়া গুলি চালিয়ে অগুণতি রেভোলিউসনারিকে তারা মেরেছে, হাজার হাজার মানুষকে জেলে পুরেছে। যে ভাবেই হোক, বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনকে গলা টিপে মারতেই হবে।

বিহারের এই প্রান্তে, নকীপুরের পঞ্চাশ ষাট মাইলের মধ্যে যে আন্দোলন হয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেদিনের যুবক মহীতোষ। চারপাশের হাজার হাজার মানুষ তাঁর ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

বেয়াল্লিশের আগস্ট মুভমেন্টের সময় পুলিশ প্রথম নকীপুরে গুলি চালায় আর প্রথম গুলিটাই লেগেছিল মহীতোষের কাঁধে। স্বাধীনতার তিনিই প্রথম সেনাপতি যাঁর রক্তে নকীপুরের মাটি ভিজে গিয়েছিল।

আহত হয়ে পড়ে যাবার পর পুলিশ তাঁকে ভ্যানে তুলে জেলে নিয়ে যায়। বিচারে সাত বছরের জেল হয়েছিল কিন্তু সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হবার পর মহীতোষ মুক্তি পান।

স্বাধীনতার পর তাঁকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দেশ-সেবার পুরস্কার হিসেবে নতুন স্বাধীন গভর্নমেন্টে একটা বড় দায়িত্ব

'আমি মহীতোষ চৌধুরীজির সাথ থোড়া বাতচিত করতে চাই।'

কণ্ঠস্বরটি অচেনা। হিন্দী বাংলায় মিশিয়ে এখানকার অনেকেই কথা বলে। গলা শুনে লাইনের ওধারের লোকটাকে কিছুতেই সনাক্ত করা যায় নি। মহীতোষ বলেছিলেন, 'আমিই মহীতোষ চৌধুরী।'

এবার লোকটার গলায় সম্ভ্রম বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা ফুটে বেরিয়েছিল, অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে সে বলেছিল, 'কী সৌভাগ্য আমার, খুদ চৌধুরীজীর সাথ কথা বলছি! প্রণাম—'

'নমস্কার।' মহীতোষ বলেছিলেন, 'কিছু মনে করবেন না, ফোনে গলা শুনে বুঝতে পারছি না আমি কার সঙ্গে কথা বলছি।'

'আমার নাম বললে চিনতে পারবেন না। আমি খুবই ছোটামোটা আদমী।' লোকটার কণ্ঠস্বর আরো বিনীত শুনিয়েছিল।

মহীতোষ বুঝতে পারছিলেন, লোকটা নাম জানাতে চাইছে না। একটু চুপ করে থেকে বলেছেন, 'আমার কাছে আপনার কি কোন দরকার আছে?'

'হাঁ চৌধুরীজি। খুবহি ছোটামোটা কাম।'

বোঝা যাচ্ছিল, 'ছোটামোটা' শব্দটা লোকটার কথার মাত্রা, এক ধরনের মুদ্রাদোষই বলা যেতে পারে। মহীতোষ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার কাজটা কী—বলুন।'

লোকটা তক্ষুণি উত্তর দেয় নি। কিছুক্ষণ পর গলা খাকরে যা বলেছিল তা এইরকম। চৌধুরীজি বহুত বড়ে আদমী। তিনি নকীপুরের গৌরব। শুধু নকীপুর কেন, পুরা হিন্দুস্তান তাঁকে নিয়ে গর্ব বোধ করতে পারে। নকীপুরের বাসিন্দাদের বিরাট সৌভাগ্য, চৌধুরীজির মতো মানুষ এখানে আছেন। তাঁর—

লোকটা যেভাবে যাচ্ছিল বলে তাতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন মহীতোষ। তার উচ্ছ্বাসের তোড় সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছিল না। বাধা দিয়ে মহীতোষ বলেছিলেন, 'আমার কথা থাক। আপনার কাজের কথাটা বলুন।'

'তা ত বলবই। খুবই ছোটামোটা কথা, সিরিফ এক মিনিটকা কাম। আপনার মতো বড়ে আদমীর সাথ বাতচিত করার ত সৌভাগ্য হয় না। আজ যখন সুযোগ হয়েছে তখন একটু কথা বলি। শুনা হ্যায়, আংরেজদের সাথ আজাদীর জন্যে ভারী লড়াই করেছিলেন—'

লোকটাকে ত দেখা যাচ্ছিল না। না দেখলেও টের পাওয়া গিয়েছিল, শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে তার চোখমুখ জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু এই প্রশস্তি জাতীয় কথা শুনতে ভয়ানক সঙ্কোচ হয় মহীতোষের। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে একটু বেরুতে হবে। দয়া করে যদি কাজের কথাটা শেষ করে ফেলেন—' এমনিতেই তখন বেরুবার দরকার ছিল না। পারতপক্ষে তিনি মিথ্যে বলেন না। কিন্তু লোকটার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে মিথ্যে বলা ছাড়া উপায় ছিল না।

লোকটা এবার বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, 'ও হাঁ হাঁ, বলছি। আমাদের এই নকীপুরে এক মাহিনা আগে একটা খুন হয়েছে।'

'একটা কেন, এখানে ত মাসখানেক আগে রোজ দু-তিনটে করে খুন হত। আপনি কোন খুনটার কথা বলছেন?'

'ঐ যে ভানুপ্রতাপ সহায় বলে যে লোকটা স্ট্যাবিং-এ মারা গেল—' এই পর্যন্ত বলে লোকটা থেমে গিয়েছিল।

একটু চমকেই উঠেছিলেন মহীতোষ, বলেছিলেন, 'এ কথা ত নকীপুরের সবাই জানে। কোর্টে কেসও উঠেছে।'

'হাঁ হাঁ, সবাই জানে।' বলতে বলতে আচমকা গলার স্বরটা ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে লোকটা বলেছিল, 'আপনি এই কেসে উইটনেস হয়েছেন—এ খবরও সবাই জানে।'

লোকটার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে মুহূর্তে মহীতোষের স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'জানবারই কথা। আমি ত লুকোচুরি কিছু করছি না।' নিজের অজান্তেই তাঁর গলা ঈষৎ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল।

'নেহী নেহী, আপনি লুকোছাপা করবেন কেন? এত বড় আদমী

আপনি!' লোকটা জোরে শ্বাস টানার মতো শব্দ করতে করতে বলেছিল।

এবার বেশ অসহিষ্ণুভাবেই মহীতোষ বলেছেন, 'এতক্ষণ আমরা কথা বলছি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, আপনি আমার কাছে ঠিক কী চান।'

লোকটা সরাসরি সে কথার উত্তর দেয় নি। প্রথমে সে বলেছিল, 'খুনখারাপি বহুত গান্ধা ব্যাপার—বহুত বুরা চীজ।'

'অবশ্যই।' বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন মহীতোষ।

লোকটা যেন উৎসাহিতই হয়ে উঠেছিল। বিনিয়ে বিনিয়ে জানিয়েছিল, এই সব নোংরা ব্যাপারে মহীতোষ চৌধুরীজির মতো গ্রেট ম্যানে'র থাকা উচিত না। কেননা তিনি নকীপুরে 'ভগোয়ান য্যায়সা' (ঈশ্বরের মতো) আদমী

এতক্ষণে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন মহীতোষ, 'আপনি কি আমাকে ভানুপ্রতাপ মার্ডার কেসে সাক্ষী হতে বারণ করছেন?'

'হাঁ।'

'এতে আপনার কী লাভ?'

'কুছু না, কুছু না।' লোকটা শশব্যস্তে বলে উঠেছিল, 'আপনার মতো রেসপেক্টেড পার্সন এই সব বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কষ্ট হয়। আপনি আমাদের মাথার মণি।'

খুব শান্ত গলায় মহীতোষ বলেছিলেন, 'আপনি কি চান না, খুনীদের শাস্তি হোক?'

'জরুর, জরুর--'

গলার আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল, লোকটা চমকে উঠেছে। থতমত খেয়ে সে বলেছে, 'লেকেন, লেকেন—'

'লেকেন কী?' পরিষ্কার জানতে চেয়েছিলেন মহীতোষ।

'কোর্টে যখন কেস উঠেছে তখন সাজা ওদের হবেই। আমি

স্পেশালি বিনতি করছি, আপনি উইটনেস হবেন না।' লোকটা কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা উটকো ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দিচ্ছিল।

'আপনার 'বিনতি' আমার পক্ষে রাখা সম্ভব না। কারণ আমি সাক্ষ্যি না দিলে ওদের পানিশমেন্ট হবে না। খুনীরা বেকসুর খালাস পেয়ে যাক, এ আমি চাই না।'

বেশ খানিকক্ষণ লাইনের ওধার থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি। তারপর লোকটা বলেছিল, 'ঠিক আছে চৌধুরীজি, এখন আপনার বাইরে বেরুবার জরুরত আছে। দু-এক রোজ পর আবার ফোন করব। আমার ছোটামোটা রিকোয়েস্টটার কথা মনে রাখবেন। প্রণাম।' বলেই লাইন কেটে দিয়েছিল লোকটা।

এরপর দিন কয়েক খানিকটা অস্বস্তির মধ্যে কেটেছিল মহীতোষের। লোকটা কে হতে পারে, কিছুতেই তাঁর মাথায় আসছিল না। জীবনে যত মানুষের কণ্ঠস্বর তিনি শুনেছেন, সব মনে করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এমন গলা আগে আর কখনও শোনেন নি। তিনি নকীপুরের সব চাইতে শ্রদ্ধেয় এবং বিখ্যাত ব্যক্তি বলেই কি লোকটা তাঁকে খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়তে দিতে চায় না? সেই কারণেই কি সে চিন্তাগ্রস্ত? নাকি অন্য কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে?

চতুর্থ দিন সকালে, লোকটার কথা যখন প্রায় ভুলেই গেছেন মহীতোষ, সেই সময় আবার তার ফোন এল।

'প্রণাম চৌধুরীজি!'

মহীতোষ চমকে উঠেছিলেন, 'নমস্কার!'

'ঠিক তিন দিন পর আবার ফোন করছি। আমার সেই কথাটা জরুর এর মধ্যে ভেবেছেন, তাই না?' সাগ্রহে লোকটা জিজ্ঞেস করেছিল।

মহীতোষ প্রথমে উত্তর দেন নি।

লোকটা ফের বলেছিল, 'আমি জানতাম, আমার রিকোয়েস্টটা আপনি রাখবেন এই সব বাজে বুরা ব্যাপারে—'

তার কথা শেষ হবার আগেই মহীতোষ একটু চড়া গলায় বলেছিলেন, 'আপনার অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব না। সাক্ষি আমি দেবই।'

লোকটা যেন বিমর্ষ হয়েই পড়েছিল, 'আমার এই ছোটামোটা রিকোয়েস্টটা আপনি রাখবেন না? বহুত আপসোসকা বাত। ঠিক হ্যায় চৌধুরীজি, দো-চার রোজ বাদ আবার ফোন করব। আপনি ভাল করে, সব দিক বিবেচনা করে ভাবুন। প্রণাম—'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'নতুন করে ভাবাভাবির কিছু নেই। সব দিক—' কথাটা শেষ হবার আগেই টের পেয়েছিলেন, লোকটা লাইন কেটে দিয়েছে।

এরপর আর লোকটাকে ভুলতে পারেন নি মহীতোষ। মাথার ভেতর অস্বস্তিকর পোকার মতো সে যেন অনবরত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল।

ঠিক দু দিন পর আবার ফোন করেছিল লোকটা, 'চৌধুরীজি, প্রণাম। আশা করি, আজ একটা সুখবর পাব।'

'খুবই দুঃখিত, আপনার অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব না।'

'সব দিক বিবেচনা করে বলছেন?'

'নতুন করে বিবেচনার আর কিছু নেই। সব দিক চিন্তা করেই সাক্ষি দেবার কথা ভেবেছিলাম।'

গলার ভেতর চুক চুক শব্দ করে লোকটা এবার বলেছিল, 'আপনাদের মতো পুরানা জমানার আইডিয়ালিস্ট আর দেশপ্রেমীদের নিয়ে বহুত ঝামেলা।'

লোকটা আগে যে দু'বার ফোন করেছে তাতে তাকে ধীর স্থির মনে হয়েছে। তার বিদঘুটে অনুরোধ বা আবদার রাখতে পারবেন না জানানো সত্ত্বেও সে অসহিষ্ণু কিংবা উত্তেজিত ত হয়ই নি, বরং উল্টোটাই লক্ষ করেছেন মহীতোষ। তার গলা থেকে গদগদ ভক্তি এবং বিনয় যেন গলে গলে পড়েছে। কিন্তু এই তৃতীয় বার তার কথার ধাঁচ বদলে

গিয়েছিল। যদিও উত্তেজিতভাবে সে কিছুই বলে নি তবু মহীতোষের কানে বেসুরো ঠেকেছিল। বেশ রুক্ষ সুরেই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাদের নিয়ে কিসের ঝামেলা?'

লোকটা বলেছিল, 'কোন কিছু একবার আপনাদের মাথায় ঢুকে গেলে সেটা আর টেনে বার করা যায় না। বিলকুল ফিক্সড হয়ে বসে থাকে।'

তক্ষুণি সায় দিয়ে মহীতোষ বলেছিলেন, 'ঠিকই বলেছেন। যখন ঠিক করেছি সাক্ষি দেব তখন দেবই। ওটার আর নড়চড় হবে না।'

এর পরও লোকটা খুব শান্তভাবেই বলেছিল, 'আপনাকে আর একবার ভাববার চান্স দেব চৌধুরীজি। আপনি এখানকার সব চাইতে রেসপেক্টেড পার্সন, তাই চার বার চান্স দিচ্ছি। অন্য ছোটামোটা আদমী হলে একবারের জায়গায় দু'বার কথা বলতাম না। আপনার ডিসিসান ঠিক করে রাখবেন। চব্বিশ ঘণ্টা পর আবার ফোন করব। আচ্ছা প্রণাম।' লাইন কেটে দিয়েছিল সে।

লোকটা পরিষ্কার তাঁকে হুমকিই দিয়েছিল। মহীতোষ ফোন করে যে তাকে জানিয়ে দেবেন, এই সব শাসানি বা হুমকি তিনি গ্রাহ্য করেন না, তার উপায় নেই। কেননা লোকটাকে মহীতোষ চেনেন না, তার ফোন নাম্বার জানেন না। এমনিতে তিনি শান্ত বিচক্ষণ সহিষ্ণু মানুষ, সামান্য কারণে অস্থির বা চঞ্চল হন না। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর মাথার ভেতর অসহ্য রাগে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ গভর্নমেন্টকেই তিনি পরোয়া করেন নি। আর এ ত একটা বাজে লোক, যে কিনা সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায় না, ছিঁচকে চোরের মতো নিজের নামধাম গোপন করে ফোন করে।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই শেষ বারের মতো ফোন করেছিল লোকটা।

'প্রণাম চৌধুরীজি, আপনার ডিসিসান শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল?'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ডিসিসান একই আছে। সেটা বদলাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

'আপনি তা হলে সাক্ষী হবেনই?'

'শুধু সাক্ষীই হব না, আপনি কে তা-ও খুঁজে বার করব। জানতে হবে, ভানুপ্রতাপের মার্ডার কেস থেকে কেন আমাকে সরাতে চাইছেন, এই মার্ডারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী। এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রে-সনকে দিয়ে না হলে আমি পাটনা, এমন কি দিল্লী পর্যন্ত যাব।'

লোকটা নিরুত্তেজ গলায় বলেছিল, 'সে চান্স আপনি বোধ হয় পাবেন না।'

মহীতোষ তীব্র স্বরে বলেছিলেন, 'তার মানে?'

'ভেরি সিম্পল চৌধুরীজি।' লোকটা বলেছিল, 'আপনার মনোকামনা পূর্ণ হবে না। আমি যা বলেছি তাতে রাজী হয়ে যান। তাতে আপনার ভালই হবে।'

'আমার ভালমন্দ নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।'

'অন্য কেউ হলে ঘামাতাম না। আপনি বলেই চার রোজ ফোনে ওয়ার্নিং দিলাম। এত্তে বড়ে আদমী আপনি। লেকেন এরপর আপনার সম্বন্ধে আমার আর কোন দায়দায়িত্ব রইল না।'

লোকটার অসীম স্পর্ধায় মাথার ভেতরটা টগবগ করে যেন ফুটছিল মহীতোষের। জীবনে কখনও যা করেন নি, নিজের অজান্তে তাই করেছিলেন। গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'আপনি আমাকে শাসাচ্ছেন?'

'যদি মনে করেন শাসাচ্ছি, তবে তাই। আর যদি ভাবেন একজন ওয়েল-উইশার আপনার ফিউচারের কথা চিন্তা ক'রে আপনার কল্যাণের জন্যে সৎ পরামর্শ দিচ্ছে—সেটাই ভাল শোনাবে। এখন আপনি আমার কথার যেভাবে মীনিং করেন।'

'তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।' এবার গলার স্বরটা আরো কয়েক পর্দা চড়ে গিয়েছিল মহীতোষের। রাগের ঝোঁকে

তিনি যে লোকটাকে ভদ্রতা দেখিয়ে আর 'আপনি' করে বলছেন না, সে খেয়ালও ছিল না তাঁর। 'এতদিন আমি চুপচাপ ছিলাম। নকীপুরের ক্রাইম ওয়ার্ল্ড নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। ক্রিমিনালদের কীভাবে শায়েস্তা করা যায়, এবার আমি দেখবো।'

'চেষ্টা করবেন। তবে আগে থেকেই বলে দিচ্ছি কিছুই করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে নিজের বিপদই ডেকে আনবেন। আচ্ছা প্রণাম চৌধুরীজি। এটাই কিন্তু আমার লাস্ট ফোন।' লাইন কেটে দিতে দিতে লোকটার কণ্ঠস্বর শেষবারের মতো শোনা গিয়েছিল, 'ছোটামোটা আদমীটার কথা কানে তুললেন না। বহুত দুখকা বাত।'

এরপর এখানকার পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন থেকে শুরু করে ডিভিসনাল কমিশনার পর্যন্ত অনেককেই ফোনের ব্যাপারটা জানিয়েছেন মহীতোষ। সবাই উদ্বিগ্ন মুখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছেন— লোকটা তাঁকে ঠিক কী বলেছে, কী ধরনের হুমকি দিয়েছে, তাঁর জীবনের আশঙ্কা আছে কিনা, ইত্যাদি। মহীতোষ সব কথার উত্তর দিয়েছেন। এরপর স্থানীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেসন জানিয়েছে, যে 'আন-আইডেন্টিফায়েড' লোকটা মহীতোষকে ফোনে হুমকি দিয়েছে তাকে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করবে। তাঁর মতো শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট মানুষকে কেউ শাসাবে, এটা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তবু সাবধানের মার নেই। আজকালকার ক্রিমিনালরা খুবই বেপরোয়া। তাই মহীতোষকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন রাস্তায় বেশি বার না হন, আর বেরুলেও সতর্কভাবে চলাফেরা করেন।

এই পরামর্শটা অবশ্য শোনেন নি মহীতোষ, তিনি আগের মতোই যখন ইচ্ছে বাইরে বেরিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছে ঘুরেছেন।

এদিকে নকীপুরের অ্যাডমিনিস্ট্রেসন অনেক চেষ্টা করেও সেই লোকটাকে খুঁজে বার করতে পারে নি।

আড়াআড়ি রাস্তাটা এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে গেছে। বাস, অটো-

প্রাইভেটকার, গণ্ডা গণ্ডা সাইকেল রিকশা, ট্যাক্সি এবং টাঙ্গার ঝাঁক আর নেই। ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলে সিগন্যাল দিল। সঙ্গে সঙ্গে এদিককার ট্রাফিক ছুটতে শুরু করল।

জয়াদের অটো-রিকশা ডাইনে ঘুরে এগিয়ে চলল। এখান থেকে কয়েক শ গজ দূরে কোর্ট। গাড়িটা যতই কোর্টের কাছাকাছি যাচ্ছে ততই ভয় এবং উৎকণ্ঠা বাড়ছে জয়ার। অথচ তার এই উদ্বেগের বিশেষ কারণ থাকতে পারে না। প্রথমত, এখন এই প্রকাশ্য দিবালোকে চারদিকে অগুণতি মানুষ থিক থিক করছে। তা ছাড়া রয়েছে প্রচুর গাড়িঘোড়া, মাঝে মাঝে পুলিশও দেখা যাচ্ছে। তবু ভয়টা কিছুতেই কাটছে না জয়ার। সে আরো একবার বলল, 'বাবা, আমরা বরং ফিরেই যাই।'

এর আগে জয়া যখন তার উৎকণ্ঠার কথা জানাচ্ছিল তখন মহীতোষকে খুবই জেদী গম্ভীর এবং একগুঁয়ে দেখাচ্ছিল। দৃঢ় গলায় তিনি জানিয়েছিলেন ভানুপ্রতাপ মার্ডার কেসে সাক্ষি দেবেনই। এখন কিন্তু বেশ মজাই পাচ্ছেন তিনি। হাল্কা গলায় বললেন, 'তুই এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন খুকু? কে একটা উটকো লোক ফোনে কী বলেছে, সেই ভয়ে—' মহীতোষের কথা শেষ হল না, তার আগেই উল্টো দিক থেকে দারুণ শব্দ করে একটা মোটর বাইক ষাট সত্তর মাইল স্পীডে হাওয়া কেটে বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই শব্দের সঙ্গে মিশল পর পর অনেকগুলো বোমা ফাটানোর আওয়াজ। বোমাগুলো এত জোরালো, মনে হয় কানের পর্দা ফেটে যাবে।

চমকে মহীতোষ এবং জয়া মোটর বাইকটার দিকে তাকাল। সামনে বসে যে ওটা চালাচ্ছে তার মাথায় সেকালের গ্রীক যোদ্ধাদের কায়দায় বিরাট হেলমেট, গালে চাপ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। পরনে টাইট জীনস, হাতে চামড়ার গ্লাভস। ব্যাক সীটে যে বসে আছে তারও একই পোশাক এবং প্রায় একই চেহারা। গালভর্তি দাড়ি, চোখ ঢাকা গগলস। হেলমেট জীনস এবং গ্লাভস ত আছেই।

ছু'জনেরই বয়স সাতাশ আটাশের বেশি হবে না।

চকিতের জন্য চোখে পড়ল, ব্যাকসীটে যে বসে আছে সে-ই অনবরত বোমা ছুঁড়ছে। আগে আওয়াজটাই কানে এসেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে চারদিক ঢেকে দিচ্ছে। ফলে রাস্তার ভীত আতঙ্কগ্রস্ত মানুষজন যে যে দিকে পারছে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করেছে। গাড়িটাড়ি থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, দোকানপাট ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মোটর সাইকেলের এই অদ্ভুত সাজ-পোশাকের যুবক ছু'টি কারা, কেনই বা তারা প্রকাশ্য দিনের আলোয় বেপরোয়া বোমা ছুঁড়ছে—এ সব ভাববার আগেই মোটর বাইকটা জয়াদের অটো-রিকশার কাছাকাছি এসে পড়ল। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে আচমকা তিন চারটে গুলির আওয়াজ চারপাশের ধোঁয়া এবং বাতাস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটো কাতর চিৎকার শুনতে পেল জয়া। পরক্ষণেই তাদের অটো-রিকশা টাল খেয়ে বাঁ দিকের কালভার্টের কাছে একটা মোটা পিপুল গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেল, তৎক্ষণাৎ গাড়িটার সামনের দিক এবং হেড লাইট ভেঙেচুরে তুবড়ে দলা পাকিয়ে গেল যেন। ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও—বিলকুল খুন হো গিয়া।'

এদিকে জয়া টের পেল মহীতোষের মাথাটা ঘাড় থেকে আলগা হয়ে যেন তার কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়েছে আর গরম ঘন স্রোতের মতো কী যেন তার সারা শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে।

জড়ানো ঝাপসা নির্জীব গলায় মহীতোষ বার ছুই ডাকলেন, 'খুকু—খুকু—'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু রয়েছে যাতে জয়ার হৃৎপিণ্ডের শব্দ মুহূর্তের জন্য একেবারে থমকে গেল। তারপরেই 'বাবা, বাবা—' বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েই তার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।

গ্যাস-বোমার ধোঁয়া এতক্ষণে অনেকটা কেটে গেছে। জয়া দেখতে পেল, মহীতোষের কপাল গলা এবং ডান দিকের পাঁজরা থেকে গল-

গল করে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। বুলেটে বুলেটে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

প্রথম কয়েক পলক অনুভূতিশূন্যের মতো তাকিয়ে রইল জয়া। তার পরেই গলার শির ছিঁড়ে উন্মত্তের মতো চিৎকার করে উঠল, 'মেরে ফেলেছে, আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে—' মহীতোষের অসাড় বেহুঁশ শরীর ক্রমশ তার গায়ের ওপর আরো ঢলে পড়েছে। জয়ার শাড়ি জামা হাত-পা—সব রক্তে মাখামাখি হয়ে যেতে লাগল।

ওদিকে ড্রাইভারের কাঁধ থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত উথলে উথলে বেরিয়ে আসছে। খুব সম্ভব দু-একটা বুলেট তার কাঁধের মাংসে ঢুকে গেছে। অবশ্য পিপুল গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তার নাক মুখ ঠোঁট এবং কপাল আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। সব কিছু থেঁতলে গেছে। চামড়া উঠে গোটা মুখ একটা বীভৎস মাংসের পিণ্ডের মতো দেখাচ্ছে, তার ভেতর চোখ দুটোই যা অক্ষত রয়েছে। লোকটা এখনও বেহুঁশ হয়ে পড়ে নি। একটা হাত কাঁধে চেপে, আরেক হাতে মুখের রক্ত মুছতে মুছতে সে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'খুন, খুন। মোটর সাইকেলবালাকে পাকড়ো, পাকড়ো—'

তখনও মোটর সাইকেলটা বেশি দূরে যেতে পারে নি। যে সব লোক ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চারদিকে ছুটে পালাচ্ছিল তারা হঠাৎ অটো ড্রাইভার আর জয়ার চিৎকারে ঘুরে দাঁড়িয়ে মোটর সাইকেলটার দিকে হৈ হৈ করে দৌড়াতে লাগল। খুনের কথা শুনে সবার ভেতর থেকে মুহূর্তে ভয়টা কেটে গেছে। নকীপুরের মানুষ পুরোপুরি ভীরু পোকা হয়ে যায় নি। মনুষ্যত্বের খানিকটা তলানি এখনও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে। কোনক্রমে নিজের প্রাণ বাঁচানোটাই যে বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তার যে অন্য কিছু দায়দায়িত্বও থাকে, পরের বিপদে আপদে যে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, এই বোধটুকু এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি।

কিন্তু মোটর বাইকটার কাছাকাছি ঘেঁষা গেল না। এলোপাথাড়ি

গুলি এবং বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাইকটা ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

তারপরই বিশাল জনতা অটো-রিকশাটার দিকে দৌড়ে এল।

কারা থানা এবং হাসপাতালে খবর দিয়েছিল, কে জানে। দশ মিনিটের ভেতর একটা অ্যাম্বুলেন্স আর দুটো পুলিশ ভ্যান ছুটে এল। একটা ভ্যান অটো রিকশাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আর মোটর বাইকটা যে দিকে অদৃশ্য হয়েছে, জনতা দ্বিতীয় ভ্যানটাকে সেদিকটা দেখিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিৎকার করতে লাগল, 'খুনী উধরসে ভাগতা হ্যায়। তুরন্ত উধর যাইয়ে—' ভ্যানটা তৎক্ষণাৎ স্পীড বাড়িয়ে উল্কার গতিতে খানিকটা এগিয়ে ডান পাশের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। কিছু লোকজন ভ্যানটার পেছন পেছন খানিক দৌড়ে আবার জয়াদের থেঁতলানো অটো-রিকশার কাছে ফিরে এল।

চারপাশের অজস্র মানুষ, পুলিশের ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স, হৈচৈ, চিৎকার—কোনদিকেই লক্ষ্য নেই জয়ার। দু'হাতে মহীতোষের রক্তাক্ত বেহুঁশ দেহ আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে সমানে বলে যেতে লাগল, 'বাবা-বাবা—বাবা—' তার গলায় স্বর ফুটছিল না। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে শুধু আর চোখ থেকে অবিরাম স্রোতের মতো জল নেমে আসছে। জয়ার চোখের জল এবং মহীতোষের রক্ত একাকার হয়ে চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

কখন যে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা মহীতোষকে গাড়িতে তুলল এবং সেই সঙ্গে জয়াকে, তার খেয়াল নেই। বাবার বেহুঁশ নিস্পন্দ শরীর আঁকড়ে ধরে আম্বুলেন্সের ভেতর শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে রইল জয়া।

শুধু তাদের দু'জনকেই না, স্ট্রেচারে করে অটো-রিকশার ড্রাইভারকেও অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছে। লোকটা পুরোপুরি বেহুঁশ হয় নি, থেকে থেকে যন্ত্রণার ঘোরে কাতর গোঙানির মতো শব্দ করে উঠছে।

জয়াদের তুলে নিয়েই অ্যাম্বুলেন্স ছুটতে শুরু করেছিল। তার পাশাপাশি পুলিশ ভ্যানটাও চলেছে। আর পেছনে পেছনে ছুটছে হাজার হাজার মানুষ। এর মধ্যে কীভাবে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় রটে গেছে নকীপুরের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ মহীতোষ চৌধুরীকে প্রকাশ্য দিবালোকে অজ্ঞাত খুনীরা গুলি করেছে।

পনের মিনিটও লাগল না, অ্যাম্বুলেন্স নকীপুরের সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে গেল।

দুই

অ্যাম্বুলেন্সের গাড়িটা প্রথমে বিরাট গেট পেরিয়ে হাসপাতালের কমপাউণ্ডে ঢুকল। তারপর ঢুকল পুলিশের প্রকাণ্ড কালো ভ্যানটা।

পেছন পেছন উত্তেজিত উদ্বিগ্ন জনতা ছুটে আসছিল। কিন্তু পুলিশের ভ্যানটা ভেতরে ঢুকেই গেটের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন অফিসার এবং পনের কুড়িজন আর্মড পুলিশ। নিচে নেমেই পুলিশ অফিসার হুকুম দিল, 'ফটক বন্ধ কর।'

গেট বন্ধ করে চারজন পুলিশ রাইফেল হাতে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বাকি সবাই অফিসারের নির্দেশমতো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পজিসান নিয়ে দাঁড়াল। এত উত্তেজিত মানুষ ভেতরে ঢুকলে হাসপাতালের শান্ত আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা রোগীদের পক্ষেও মারাত্মক ক্ষতিকর।

এদিকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচারে করে মহীতোষ এবং অটো-রিকশার ড্রাইভারকে নামানো হয়েছে। 'কাউকে যেন ভেতরে ঢুকতে না দেওয়া হয়—' পুলিশকে এ জাতীয় নির্দেশ দিয়ে অফিসার ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সের কাছে চলে এসেছে। তার বয়স বেশি না—ত্রিশ বত্রিশ। প্রায় ছ' ফুটের মতো হাইট। ধারাল ঝকঝকে মেদহীন চেহারা, মুখে বুদ্ধির ছাপ। টান টান মেরুদণ্ড, চওড়া কপাল। গায়ের রং ফর্সাও না, কালোও না—তুইয়ের মাঝামাঝি।

অন্য সময় তার চোখেমুখে হয়ত একটা মজা বা কৌতুকের ভঙ্গি ফুটে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যে ভয়াবহ ব্যাপারটি ঘটে গেছে তাতে তাঁকে প্রচণ্ড গম্ভীর দেখাচ্ছে। গম্ভীর এবং থমথমে।

অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান থেকে মহীতোষদের বার করে নেবার পরও

বিমূঢ়ের মতো বসে ছিল জয়া। তার অনুভূতিগুলো যেন আর কাজ করছিল না, চোখের সামনে যা ঘটে গেল তার 'শক' কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে। নিজের অজান্তেই তার চোখ থেকে অনবরত জল ঝরে যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার সামান্য ঝুঁকে ডাকল, 'মিস চৌধুরীজি—' তার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল এবং সহানুভূতিতে আর্দ্র।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুখ তুলে তাকালো জয়া। আবছা ভাবে মনে হল, অফিসারটি তাকে চেনে। নইলে 'মিস চৌধুরীজি' বলত না কিন্তু সে অফিসারটিকে চিনতে পারল না। আগে কখনও দেখেছে কিনা, মনে করতে পারল না। নকীপুর থানার সবাই মোটামুটি পরিচিত। এই অফিসারটি হয়ত এখানে নতুন এসেছে।

অফিসার এবার বলল, 'আপনি কি বাড়ি ফিরবেন? গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব?'

কোথায় একটা ধাক্কা লেগে জয়ার অসাড় অনুভূতিগুলো আবার টান টান হয়ে গেল। রুদ্ধ গলায় সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'না না, বাবাকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।' জোরে জোরে ব্যাকুলভাবে সে মাথা নাড়তে লাগল।

অফিসার দ্রুত একবার জয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। তার হাত-পা শাড়ি-জামা—সব রক্তে এবং চোখের জলে মাখামাখি। অফিসারের ইচ্ছা, এগুলো বদলে জয়া আবার হাসপাতালে আসুক। কিন্তু তার যা মানসিক অবস্থা তাতে সে কথা বলা গেল না।

'আসুন আমার সঙ্গে—'

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এল জয়া। তারপর অফিসারের সঙ্গে হাসপাতালের ভেতর ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলায় এমার্জেন্সি ওয়ার্ড এবং অপারেসন থিয়েটার। সেখানে আসতেই দেখা গেল, মহীতোষ এবং অটো-রিকশার ড্রাইভারকে সোজা

অপারেসন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে হাসপাতালের সিনিয়ার সার্জন, দু-চারজন জুনিয়ার ডাক্তার, নার্স, ইত্যাদি।

দোতলার এক মাথায় সিঁড়ি। সেখান থেকে লম্বা করিডর যেখানে গিয়ে থেমেছে সেখান অপারেসন থিয়েটার। জয়ারা কয়েক পা যেতে না যেতেই মহীতোষদের নিয়ে সার্জনরা অপারেসন থিয়েটারে ঢুকে গেলেন। বিরাট কাচের পাল্লাটা মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

'ও-টি' বা অপারেসন থিয়েটারের কাছাকাছি করিডরে ক'টা খালি বেঞ্চ রয়েছে। সেখানে আসতেই হঠাৎ কী মনে পড়তে উদ্বিগ্ন মুখে অফিসার বলল, 'আপনার গায়ে গুলি বা স্পিল্‌ন্টার লাগে নি ত?'

চোখের সামনে যা ঘটে গেল তাতে জয়ার স্নায়ুগুলো একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। এর ভেতর নিজের কথা ভাববার সময় পায় নি সে। আচ্ছন্নের মতো অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

'আপনি এখানে বসুন—' বলেই অফিসার একরকম দৌড়েই অপারেসন থিয়েটারের ডান পাশে এমার্জেন্সি ব্লকের দিকে চলে গেল এবং দু মিনিটের ভেতর ফিরে এসে ব্যস্তভাবে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'এমার্জেন্সিতে। আপনার চোট টোট লেগেছে কিনা, চেক করে নেওয়া দরকার।'

জয়া উত্তর দিল না, যন্ত্রচালিতের মতো অফিসারের সঙ্গে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকল। অফিসার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তারা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তার জয়াকে নিয়ে একটা চেম্বারে চলে গেলেন। অফিসার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের ডাক্তাররা জয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। তার মাথা এবং বুকের এক্স-রে করা

হল। বাইরে থেকে যেটুকু বোঝা গেল, কোথাও চোট টোট লাগে নি। তবে এক্স-রে রিপোর্ট কাল পাওয়া যাবে। তার আগে বুকে বা মাথার ভেতর আঘাত লেগে হেমারেজ হয়েছে কিনা, জানা সম্ভব নয়। মনে হয়, কিছু হয় নি।

ঘন্টাখানেক বাদে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট থেকে বাইরে এসে প্রায় হকচকিয়ে গেল জয়া। এতক্ষণ যদিও তার নানা রকম পরীক্ষা চলছিল তবু নিজের কথা একবারও ভাবে নি, মহীতোষের ভাবনাটাই তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

অপারেসন থিয়েটারের সামনের লম্বা করিডরে এখন প্রচুর লোকজন। নকীপুরের এম এল এ রামনেহাল দুবে, গত বিধানসভা নির্বাচনে অল্পের জন্য হেরে-যাওয়া হরকিষণ শাস্ত্রী, এই অঞ্চলের ডি এম, এস পি, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অযোধ্যাপ্রসাদ, বিগ বিজনেসম্যান শিউনাথ রাজঘরিয়া, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মগনলাল আগরওয়াল, বিখ্যাত সমাজসেবক চৌধুরী গিরধরলাল সিং—এমনি অনেকে। অর্থাৎ মহীতোষকে গুলি করা হয়েছে, এই খবর পেয়ে নকীপুরের বিখ্যাত মানুষজন সব ছুটে এসেছেন। তাছাড়া সেই পুলিশ অফিসারটি—যে তাদের হাসপাতালে নিয়ে এসেছে—একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, সবাই খুব গম্ভীর উৎকণ্ঠিত এবং বিচলিত। রুদ্ধশ্বাসে, নীচু গলায় আজকের এই মারাত্মক ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন।

জয়া এদের প্রায় সকলকেই চেনে। তাদের বাড়িতে, বাবার কাছে কেউ না কেউ রোজ আসতেন। বিশেষ করে এম এল এ রামনেহাল দুবে, মিউনিসিপ্যালিটির অযোধ্যাপ্রসাদ আর নির্বাচনে হেরে-যাওয়া হরকিষণ শাস্ত্রী। সমাজসেবক চৌধুরী গিরধরলাল সিংও প্রায়ই আসেন।

গিরধর সিং মহীতোষেরই সমবয়সী। চিরকুমার। একসঙ্গে তাঁরা বড় হয়েছেন, স্কুল-কলেজে পড়েছেন, গান্ধীজির ডাকে কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। 'কুইট ইণ্ডিয়া' মুভমেন্টের

সময় সারা দেশ যখন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তখনও গিরধর চাচা বাবার পাশেই থেকেছেন। জেলও খেটেছেন একসঙ্গে। স্বাধীনতার পর মহীতোষের দেখাদেখি রাজনীতি ছেড়ে জনসেবার কাজে নেমেছেন তিনি। নকীপুর টাউন থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে 'আরোগ্যধাম' নামে কুষ্ঠ রোগীদের যে কলোনিটা রয়েছে তিনি সেখানেই থাকেন, পরম মমতায় রোগীদের সেবা করেন। মহীতোষের মতোই স্বাধীনতার পর লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াতে অনুরোধ করা হয়েছিল, নির্বাচনে না দাঁড়ালে রাজ্যসভার মেম্বারশিপও দিতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি রাজী হন নি। দেশসেবার স্বীকৃতি হিসেবে যে তাম্রপত্র বা পেনসনের ব্যবস্থা আছে, তা-ও তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গিরধর চাচা বলেছেন, 'স্বাধীনতার জন্যে যে লড়াই করেছি, জেল খেটেছি, সে কি কিছু পাব বলে? আমি একা মানুষ, প্রয়োজন খুব সামান্য। ও সবে আমার দরকার নেই।' গিরধর চাচা চিরকাল একই রকম আছেন—নির্লোভ, আইডিয়ালিস্ট, চরিত্রবান। কোন প্রলোভনেই তাঁকে টলানো যায় না।

হরকিষণ বা রামনেহাল মহীতোষের চেয়ে অনেক ছোট। দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশের অনেক নিচে। রামনেহালের ধারাল চেহারা। হাইট বেশ ভালই। টকটকে রং, চোখের তারা দুটো বাদামী। চওড়া জুলপি, নাকের তলায় সূক্ষ্ম গোঁফ। গোঁফটার পা .চর্যায় রামনেহালের অনেকটা সময় যে কেটে যায় তাতে সন্দেহ নেই। চওড়া কপাল তাঁর, ব্যাকব্রাশ করা চুল। এক পলক তাকালেই বোঝা যায়, মানুষটা বেশ শৌখিন। পরনে ধবধবে চুস্ত আর চিকনের কাজ-করা লক্ষ্ণৌ-এর পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়-তোলা সাদা নাগরা, গলায় সোনার হার।

হরকিষণ রামনেহালের সমবয়সী হলেও আদৌ শৌখিন নয়। গোলগাল মাংসল চেহারা, চোখের দৃষ্টি শান্ত। মুখে সর্বক্ষণ স্নিগ্ধ একটি হাসি লেগেই আছে। নকীপুরের সবাই জানে, হরকিষণ নিষ্ঠাবান ধার্মিক টাইপের মানুষ। সকালে এবং সন্ধ্যায় পুজোটুজো করেন। তাঁর

কপালে থাকে শ্বেত চন্দনের লম্বা তিলক। পোশাক-আশাকের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, এ সব ব্যাপারে খুবই উদাসীন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে মোটা কাপড়ের আধ ময়লা পাজামা এবং পাঞ্জাবী।

হরকিষণ এবং রামনেহাল পোস্ট-ইণ্ডিপেনডেন্স অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের পলিটিসিয়ান। কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদ সম্পর্কে তা বলা যাবে না। তাঁর বয়স ষাটের ওপরে। মাথার একটা চুলও আর কাঁচা নেই। মোটা থলথলে ভারী চেহারা। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই মানুষটাও একসময় ইংরেজদের সঙ্গে লড়েছেন, জেলটেল খেটেছেন।

এঁরা সবাই অন্য সময় ত জয়াদের বাড়ি আসেনই, কিন্তু অ্যাসেম্বলি পার্লামেন্ট বা মিউনিসিপ্যাল ইলেকসান এলেই দিনে অন্তত চার-পাঁচ বার হানা দেবেনই। এঁদের সবারই ইচ্ছা, মহীতোষ তাঁদের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামুন, জনসভায় দু-একটা বক্তৃতা দিন। তাঁর মতো শ্রদ্ধেয় মানুষ যাঁর পক্ষে প্রচারে নামবেন তিনি যে জিতবেন, এ একেবারে অবধারিত। কিন্তু মহীতোষ রাজী হন না। তখন তাঁরা হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন, বক্তৃতা না দিন, ক্যাম্পেন না করুন, প্রচারপত্রে তাঁর নামটা যেন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। মহীতোষ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এখনকার রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। স্বাধীনতা ব্যাপারটা তিনি বুঝতেন কিন্তু এখনকার পলিটিকস তাঁর মাথায় ঢোকে না। এর সঙ্গে নিজেকে জড়াবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর নেই। রামনেহালরা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।

কিন্তু মহীতোষ যতই তাঁদের বিদায় করতে চান, তাঁরা ঘুরে ঘুরে আসেন। যাঁদের প্রচণ্ড গরজ রয়েছে তাঁরা কি সহজে মহীতোষকে রেহাই দেবেন?

এবার মাস তিনেকের মধ্যেই মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসান। তার ঠিক চারমাস বাদেই বিধানসভার নির্বাচন। কাজেই ইদানীং অযোধ্যা-প্রসাদ, রামনেহাল এবং হরকিষণ তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দিনে দু-তিন

বার করে হানা দিচ্ছিলেন। যদি মহীতোষকে কোনরকমে নিজের দিকে টানা যায়—এই হল প্রত্যেকের উদ্দেশ্য।

জয়াকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন রামনেহাল। লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি দ্রুত তাঁর কাছে চলে আসেন। জয়া যেমন এঁদের চেনে, রামনেহালরাও তাঁকে চেনেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁরা জয়াকে দেখে আসছেন। রামনেহাল নিচু উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলেন, তার চোট-টোট লেগেছে কিনা, ডাক্তাররা কী বললেন, ইত্যাদি।

হরকিষণের সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবু এতটুকু সময় বাজে খরচ না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে কাছে এসে বললেন, তোমার কিছু হয় নি ত জয়া বহান?'

বিহ্বলের মতো জয়া শুধু মাথা নাড়ল।

হরকিষণের উৎকণ্ঠা খানিকটা কাটল যেন. 'যাক, তোমার যে কিছু হয় নি, এটা ভগোয়ানের দয়া।' পরক্ষণেই তাঁর মুখে চোখে তীব্র উদ্বেগ ফুটে বেরোয়, 'লেকেন চৌধুরীজির জন্য বুক কাঁপছে। ডাক্তাররা কী খবর দেবে কে জানে।' বলতে বলতে কব্জি উল্টে এক পলক হাতঘড়িটা দেখে নেন, 'পুরা দেড় ঘণ্টা হল, চৌধুরীজিকে অপারেসন থিয়েটারে নিয়ে গেছে। কী হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হরকিষণ যাঁর কাছে গত নির্বাচনে হেরে গেছেন সেই এম এল এ রামনেহাল হবে বলে উঠলেন, 'খুব বড় অপারেসন ত। শুনেছি চার পাঁচটা বুলেট লেগেছে। সেগুলো বার করতে সময় লাগবে।'

হরকিষণ ভারী গলায় বললেন, 'কালী মা আর ভগোয়ান বিষ্ণুজি চৌধুরীজিকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

রামনেহাল একই সুরে বললেন, 'হাঁ হাঁ, জরুর। নকীপুরের সব আদমী তা-ই চায়।' বলতে বলতেই তাঁর মুখের পেশী এবং চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে. 'আজকাল নকীপুর অ্যান্টিসোসাল আর খুনীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। তাদের বুকের পাটা এত বেড়েছে যে চৌধুরীজির মতো রেসপেক্টেড পার্সনের ওপর দিনের বেলা, হাজার হাজার মানুষের সামনে

গুলি চালায়। এটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।'

এটা যে হাসপাতাল এবং মাত্র কয়েক গজ দূরে বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দু'টি মানুষের দেহে যে বিশাল অপারেসন চলছে তা ভুলে গিয়ে হরকিষণ প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, 'কভী নেহী। খুনীদের কিছুতেই ছাড়া হবে না। চৌধুরীজির ওপর যারা গুলি চালিয়েছে তাদের আমি ফাঁসিতে চড়াবই।'

'জরুর।'

নির্বাচনে বিজয়ী এবং পরাজিত—দু'জনেই বন্দুকবাজদের ব্যাপারে একমত হয়ে যান।

বিমূঢ়ের মতো জয়া হরকিষণ আর রামনেহালের দিকে তাকাচ্ছিল। তাঁদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। দুর্বোধ্য অচেনা কতকগুলো শব্দের মতো সেগুলো তার মাথার ওপর দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় আস্তে আস্তে গিরধর সিং জয়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন। গিরধর সিংও এ অঞ্চলের খুবই শ্রদ্ধেয় মানুষ। রামনেহাল এবং হরকিষণ সসম্ভ্রমে একটু সরে দাঁড়ান।

গিরধর জয়ার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'জয়া বেটি—' তাঁর কণ্ঠস্বর মমতা এবং সহানুভূতিতে সিক্ত।

গিরধরের স্পর্শে এমন কিছু ছিল যাতে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল জয়ার। ছোট্ট অসহায় বালিকার মতো তাঁর বিশাল বুকে নিজের মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল। ঝাপসা গলায় বলল, 'বাবার কি হবে চাচাজি?' তার চোখের জলে গিরধরের বুক ভিজে যেতে লাগল।

গিরধরের চোখও জলে ভরে গেছে। কোমল হাতে জয়ার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় তিনি বললেন, 'কাঁদিস না মা—রো মাত।'

জয়ার কান্না থামল না।

গিরধর এবার বললেন, 'এত ভেঙে পড়লে ত চলবে না মা।'

বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় তাঁর, 'ভাবীজি কি খবরটা জানেন ?'

হকচকিয়ে গিরধরের বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলল জয়া। অজানা বন্দুকবাজেরা গুলি চালাবার পর এত সব ঘটনা ঘটে গেছে যে মায়ের কথা খেয়াল ছিল না। জয়া আস্তে মাথা নাড়ল, 'জানি না। তবে—'

'কী ?'

'সারা শহরের লোক জেনে গেছে। মা কি আর শোনে নি ?'

'শুনলে নিশ্চয়ই চলে আসতেন ভাবীজি! এমন মারাত্মক ঘটনা, ভাবীজিকে জানানো দরকার।'

'কিন্তু চাচাজি—' বলতে বলতে থেমে গেল জয়া। তার মা পক্ষাঘাতের রুগী। বছর পাঁচেক হল, কোমর থেকে নিচের দিকটা অসাড় হয়ে গেছে। নড়াচড়ার শক্তি নেই। দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। মাঝে মধ্যে হুইল চেয়ারে বসিয়ে বাড়ির ভেতরই একটু আধটু ঘোরায় জয়ারা। এই অবস্থায় মাকে এরকম ভয়ঙ্কর একটা খবর দেওয়া ঠিক হবে কিনা সে ভেবে উঠতে পারছে না। খবরটা শুনেই হয়ত মায়ের মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে।

জয়ার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন গিরধর। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'ভাবীজির অবস্থা আমি জানি। লেকেন এই খবরটা না দিলে পরে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না।'

ওদিকে করিডরের আরেক মাথায় গত নির্বাচনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, রামনেহাল এবং হরকিষণ এ অঞ্চলের ডি এম এবং এস পি'র সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁদের জোরালো দাবি, যেভাবেই হোক, অজ্ঞাত বন্দুকবাজদের ধরতেই হবে। এ ব্যাপারে পুলিশ বা অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের কোন রকম গাফিলতি সহ্য করা হবে না। নকীপুরে এখন 'জঙ্গলের রাজত্ব' চলছে। সেটা চলতে দেওয়া হবে না। একজন মাননীয় দেশপ্রেমীর ওপর দিনদুপুরে যেভাবে গুলি চালানো হয়েছে, একটা স্বাধীন কান্ট্রির পক্ষে তা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। খুনী বন্দুকবাজ

বুটলেগার স্মাগলার রেপিস্ট এবং আরো হাজার ধরনের অ্যান্টিসোসালে নকীপুর ভরে গেছে। তাদের হাত থেকে এই শহরকে মুক্ত করতেই হবে। তবে সবার আগে মহীতোষকে যারা গুলি করেছে তাদের ধরা চাই। সাত দিনের মধ্যে যদি পুলিশ তাদের জেলে পুরতে না পারে এস পি এবং ডি এম-এর অফিসের সামনে ধর্না এবং ডেমনেস্ট্রেসন শুরু করা হবে।

ডি এম এবং এস পি দু'জনেই জানালেন, মাননীয় জননেতারা যা বলছেন তার সঙ্গে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত। সাতদিনের ভেতরই অজ্ঞাত বন্দুকবাজদের কোমরে দড়ি এবং হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরাবেনই। তাঁরা একরকম স্বীকারই করলেন, দিনের বেলা থানা থেকে মাত্র তিনশো গজ এবং কোর্ট থেকে দুশো গজ তফাতে বন্দুকবাজরা যেভাবে গুলি চালাবার হিম্মত দেখিয়েছে, সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের পক্ষে খুবই লজ্জার ব্যাপার।

একটু আগে রামনেহাল এবং হরকিষণ প্রায় এই কথাগুলোই জয়াকে বলেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, আজকের গুলি চালানোর ঘটনাটা খুব সহজে চাপা পড়বে না। রাজনৈতিক নেতারা এবং তাদের পার্টি-গুলো এ নিয়ে নকীপুর তোলপাড় করে ফেলবে।

জয়া বা গিরধর হরকিষণদের কথা শুনছিলেন না। গিরধর বললেন, 'কাউকে বাড়ি পাঠিয়ে ভাবীজিকে খবরটা দিতেই হবে।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কাকে পাঠাবেন?'

এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে গিরধর বললেন, 'মনে হচ্ছে, পুলিশেরই সাহায্য নিতে হবে।'

সেই পুলিশ অফিসারটি একধারে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া জয়াদের লক্ষ্য করছিল। কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, 'আমি কি আপনাদের বাড়ি যাব?'

গিরধর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দেখা গেল, করিডরের শেষ মাথায় একটা হুইল চেয়ারে প্রভাবতীকে বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে বিকাশ। প্রভাবতী জয়ার মা। তা হলে ওঁরা খবরটা

পেয়েই গেছেন।

মাকে দেখামাত্র উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল জয়া। তার পেছনে পেছনে গিরধর, হরকিষণ, রামনেহাল, ডি এম, এস পি, অযোধ্যাপ্রসাদ এবং সেই পুলিশ অফিসারটিও লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল।

প্রভাবতীর কাছে এসে হাঁটু মুড়ে দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরল জয়া।

রুগ্‌ণ পঙ্গু রক্তশূন্য দুর্বল চেহারা প্রভাবতীর। চুল উঠে উঠে কপালটা বিশাল হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি ফ্যাকাসে। সারা শরীর জুড়ে শুধু ক্ষয়ের চিহ্ন।

পাখির বুকের মতো মায়ের অস্থিসার রোগা বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে জয়া কেঁদে ফেলল, 'মা, এ আমাদের কী হল ?'

ক্ষীণ গলায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রভাবতী বলতে লাগলেন, 'যা শুনলাম তা কি তাহলে সত্যি ? ও ত কখনো কারো ক্ষতি করে নি।' তাঁর জ্যোতিহীন চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অবিরল জল ঝরতে লাগল।

জয়া উত্তর দিল না। প্রভাবতীর বুকের অস্থির ধুকপুকুনির শব্দ শুনতে শুনতে পাগলের মতো সমানে মুখ ঘষতে লাগল।

প্রভাবতী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'ও কোথায় ?'

কে যেন বলল, 'অপারেসন থিয়েটারে।'

'ও কি এখনও বেঁচে আছে ?'

'ডাক্তাররা বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না প্রভাবতী। বোঝা গেল, অসহ্য কষ্টে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। প্রভাবতীর পঙ্গু শরীর তোলপাড় করে, দুর্বল গলা চিরে অস্পষ্ট কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

মাকে কাঁদতে দেখে জয়ার কান্নাটা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বিকাশ একপাশে চুপচাপ বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বুকের ভেতর থেকেও জয়াদের মতোই অবুঝ কান্না ঢেউয়ের মতো উঠে

আসছিল কিন্তু শব্দ করে কাঁদতে পারছিল না, নিরেট লোহার বলের মতো সেটা গলার কাছে বার বার আটকে যাচ্ছিল। ঢোক গিলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। প্রভাবতীদের কাছে এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা ঝাপসা গলায় কোন রকমে সে বলতে পারল, 'কাঁদবেন না কাকিমা, কাঁদবেন না। জয়া কেঁদো না। ডাক্তাররা নিশ্চয়ই মহীকাকাকে বাঁচিয়ে তুলবেন।'

নকীপুরের যে পাড়ায় মহীতোষদের বাড়ি, তার কাছাকাছিই বিকাশরা থাকে। মহীতোষদের মতো অত পুরনো না হলেও তিন জেনারেসন ধরে বিকাশরা নকীপুরের বাসিন্দা।

বিকাশের বয়স আটাশ উনত্রিশ। সে দারুণ ঝকঝকে আর স্মার্ট। এবং খুবই সুপুরুষ। এখানকার একটা প্রাইভেট ফার্মে সে মাঝারি ধরনের একজিকিউটিভ। তা ছাড়া ফোটোগ্রাফির দিকে তার প্রচণ্ড ঝোঁক। চমৎকার ফটো তোলে বিকাশ। অ্যামেচার ফোটোগ্রাফার হিসেবে বিকাশের খুব সুনাম। তার ফোটো কলকাতা দিল্লী পাটনা এবং বম্বের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয়।

ছোটবেলা থেকেই জয়া আর সে একসঙ্গে একই পাড়ায় বড় হয়ে উঠেছে। কলেজে পড়তে পড়তেই তারা বুঝতে পেরেছিল, একজনকে ছাড়া আরেক জনের চলবে না। কলেজের পর ইউনিভারসিটি, ইউনিভারসিটির পর চাকরিতে ঢুকেছে বিকাশ। আর জয়া নকীপুরের জানকী দেবী উইমেনস কলেজে লেকচারারের চাকরি পেয়েছে। তার সাবজেক্ট—ইতিহাস। নকীপুরের মোটামুটি সবাই জানে, ওদের বিয়েটা একেবারে অবধারিত। মহীতোষ এবং বিকাশের বাবা রমানাথ ঠিকও করে রেখেছেন, দু-একমাসের মধ্যেই একটা শুভ দিন দেখে কাজটা চুকিয়ে ফেলবেন।

বিকাশই শুধু না, গিরধর হরকিষণ রামনেহাল এবং ডি এম থেকে শুরু করে যাঁরাই হাসপাতালে এসেছেন, সবাই জয়া আর প্রভাবতীকে শান্ত করতে চাইছেন। তাঁদের আন্তরিকতা সহৃদয়তা বা সহানুভূতিতে

এতটুকু ফাঁক নেই কিন্তু জয়াদের কান্না কিছুতেই থামছে না।

এরই মধ্যে একসময় অপারেসন থিয়েটার থেকে নেমে এলেন নকীপুরের সরকারী হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল সার্জন ডাক্তার প্রকাশনারায়ণ মিশ্র। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু এখনও মেদহীন, টান টান, অটুট চেহারা। চুল বেশির ভাগই সাদা তবু বয়স তাঁর গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি।

এই মুহূর্তে ডাক্তার মিশ্রর চেহারাটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মনে হয় তাঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। চুল এলোমেলো, মুখ গম্ভীর এবং থমথমে, চোখ লালচে। সামনের অ্যাপ্রন কুঁচকে দলামোচড়া।

ডাক্তার মিশ্রর চোখে মুখে পোশাকে এমন একটা মারাত্মক সংকেত ছিল যাতে সবাই চমকে উঠল। নিজেদের অজান্তেই তাঁরা পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। কারো খেয়াল রইল না, পেছনে হুইল চেয়ারে প্রভাবতী এবং তাঁর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জয়া।

চশমা খুলে হতাশ এবং বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডাক্তার মিশ্র। ঝাপসা কাঁপা গলায় বললেন, 'স্যরি, চৌধুরীজিকে বাঁচাতে পারলাম না। বুকে পেটে সবসুদ্ধু পাঁচটা বুলেট ঢুকেছিল। বডি একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ব্লিডিং হয়েছে প্রচুর। কিছুই করা গেল না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে সীমাহীন আক্ষেপ ফুটে বেরুল, 'আমার চোখের সামনে একটা গ্রেট সোল চলে গেল। তবে অটো রিকশাওলাটা হয়ত বেঁচে যাবে।'

ডাক্তাররা এমনিতে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে নিস্পৃহ দর্শক। ডাক্তার মিশ্র অনেক মৃত্যু দেখেছেন। কিন্তু মহীতোষের মৃত্যু তাঁকে খুবই অভিভূত করে ফেলেছে। অদ্ভুত এক আবেগে তাঁর চোখ চিকচিক করছে। এই আবেগটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা ডাক্তার মিশ্র এই শহরেরই মানুষ। আজন্ম তিনি মহীতোষকে শ্রদ্ধা করে আসছেন। মহীতোষের মতো একজন সৎ হৃদয়বান নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমীর এ জাতীয় শোচনীয় মৃত্যু যেমন অভাবনীয় তেমনি ভয়ঙ্কর। এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা যে কোন মানুষকে আপ্লুত করবেই।

প্রভাবতী এবং জয়া ডাক্তার মিশ্রর কথা শুনতে পেয়েছিল। মুহূর্তে প্রাণ ফাটানো কান্নার শব্দ দীর্ঘ করিডরের বাতাস চিরে চিরে দিতে লাগল।

চমকে সবার মাথার ওপর দিয়ে প্রভাবতীর দিকে তাকালেন ডাক্তার মিশ্র। বললেন, 'এ কি, ভাবীজিকে এখানে কে নিয়ে এসেছে?' তারপর এদিক সেদিক তাকাতে তাকাকে বিকাশকে দেখতে পেলেন। বিকাশকে তিনি চেনেন এবং মহীতোষদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক জানেন। তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'ভাবীজি আর জয়াকে এক্ষুণি ওদের বাড়ি নিয়ে যাও। ভাবীজির যা অবস্থা তাতে এই শোকের ধাক্কা সামলে ওঠা কঠিন। একটা ঘুমের ওষুধ লিখে দিচ্ছি। বাড়ি নিয়ে গিয়েই খাইয়ে দেবে। ঘুমোতে না পারলে কেঁদে কেঁদেই উনি মারা যাবেন। এখানে ডেডবডি নিয়ে আমার অনেক কাজ আছে। নইলে আমিই সঙ্গে যেতাম।' একটু থেমে বললেন, 'সন্ধ্যের পর ভাবীজিকে একবার দেখে আসব।' গিরধরকে বললেন, 'আপনি ওঁদের সঙ্গে যান।'

মহীতোষের মৃত্যুর খবরটা শোনামাত্র কপালের দু'পাশের রগগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল বিকাশের। লোহার বলের মতো যে কান্নাটা গলার কাছে আটকে আছে, সেটা সব কিছু ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রাণপণে ঠোঁট টিপে কান্নাটা ঠেকিয়ে রেখেছে সে। তবু টের পাচ্ছে চোখের মণি ফাটিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে বলল, 'কিন্তু এতটা রাস্তা হুইল চেয়ারে করে কাকিমাকে নিয়ে যাব কী করে? তা ছাড়া ওঁদের দু'জনের এখন যা অবস্থা!'

ডাক্তার মিশ্র কিছু বলার আগেই এস পি মেহের সিং বলে উঠলেন, 'আমি পুলিশ ভ্যানে ওঁদের পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলে সেই ইয়ং পুলিশ অফিসারটিকে ডাকলেন।

অফিসারটি দ্রুত কাছে এসে মেহের সিং-এর নির্দেশের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেহের সিং বললেন, 'অনুপ, তুমি বড় ভ্যানে এঁদের পৌঁছে দাও।

ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

অফিসারটির নাম অনুপ সহায়। সে বলল, 'আচ্ছা স্যার।' বলে বিকাশের দিকে ফিরল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

পা বাড়াতে গিয়েও জরুরি ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল বিকাশের। সে ডাক্তার মিশ্রর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মহীকাকুর বডিটার কী হবে? শ্মশানে নিয়ে যাবার—' কথাটা শেষ না করে সে থেমে গেল।

ডাক্তার মিশ্র বললেন, 'ডেডবডি এখন ছাড়া যাবে না। এটা একটা মার্ডার কেস। আগে পোস্ট মর্টেমের জন্যে বডি পাঠাতে হবে। কাল দুপুরের আগে ওখানকার রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বডি রিলিজ করতে করতে কাল দুপুর।'

রামনেহাল মেহের সিং-এর ডান পাশ থেকে বলে উঠলেন, 'এত বড় একজন ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন চৌধুরীজি। যেমন তেমন করে অর্ডিনারি পারসনের মতো ওঁর সংকার হতে পারে না। আমাদের পার্টি চৌধুরীজির বডি নিয়ে কাল নকীপুরে প্রসেসান বার করবে। হোল টাউন ঘুরবার পর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।'

রামনেহালের কথা শেষ হতে না হতেই মেহের সিং-এর বাঁ দিক থেকে হরকিষণ বললেন, 'চৌধুরীজি কোন একটা পার্টির প্রাইভেট প্রপার্টি নন, তিনি জনগণের নেতা। আমার পার্টিও তাঁর আখেরি যাত্রায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে। প্রসেসান আমরাও বার করব।'

রামনেহাল কিছুটা অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'একটা বডি নিয়ে দুটো পলিটিক্যাল পার্টি কী করে প্রসেসান করবে?'

খুব শান্ত গলায় হরকিষণ বললেন, 'দুই পার্টির প্রসেসান বার করার দরকার কী? ওটা আমরাই করব?'

রামনেহালকে খুবই বিরক্ত দেখাল। চোখমুখ কুঁচকে যেতে লাগল তাঁর। উত্তপ্ত মুখে বললেন, 'চৌধুরীজির ডেডবডি নিয়ে আমি কাউকে পলিটিক্যাল ফায়দা লুটতে দেব না।'

হরকিষণকে যাঁরা ভাল করে চেনেন তাঁরাই জানেন, কোন

কারণেই বা কোন প্ররোচনাতেই তিনি উত্তেজিত হন না। তাঁর গলার স্বর বিশেষ একটা পর্দার ওপর কোন কারণেই ওঠে না। রামনেহালের বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতা তাঁর মধ্যে কোন রকম প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পেরেছে বলে মনে হল না। হরকিষণের মুখের চামড়া মসৃণ এবং তেলতেলে হয়েই রইল। আর কণ্ঠস্বর আরো এক পর্দা নামিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'ফায়দা যা লুটবার তা আপনারা লুটবেন—এই তো? কিন্তু তা ত হবে না।' বলে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগলেন, 'নেহী নেহী নেহী—'

হরকিষণের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল রামনেহালের। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল। মাথার ভেতর একটা জান্তব রাগ গরম লু-বাতাসের মতো ছুটে বেড়াচ্ছিল। মারাত্মক একটা বিস্ফোরণ হয়ত ঘটে যেত। তার আগেই মেহের সিং হাতজোড় করে বলে উঠলেন, 'আপনারা পীপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ—জননেতা। এটা হাসপাতাল। দয়া করে শান্ত হোন।'

ডাক্তার মিশ্র বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বললেন, 'একটা লোক সবে মারা গেছেন। তাঁকে নিয়ে আপনারা এ সব কী আরম্ভ করেছেন! মৃত আত্মাকে কি এভাবে কেউ সম্মান জানায়! এমন কাণ্ড আমি ভাবতেও পারি না।' ডাক্তার মিশ্র এমনিতে সৎ বিনয়ী ভদ্র মানুষ। কিন্তু হাসপাতালে বা তাঁর রুগীদের ব্যাপারে কোন রকম অশোভনতা দেখলে কঠোর হতেও জানেন। তখন তাঁর মুখে কিছুই আটকায় না। এম এল এ হোক, মন্ত্রী হোক, ডি এম হোক, আর যত বড় স্টেটাসের মানুষই হোক না কেন, কাউকেই তিনি রেয়াত করেন না। এ জন্য তাঁকে সবাই খুব সমীহ করে চলে।

হরকিষণ এবং রামনেহাল প্রায় একই সুরে জানালেন, তাঁরা খুবই দুঃখিত। হাসপাতালের এই শোকাবহ পরিবেশে ঐ জাতীয় কথাবার্তা বলা ঠিক হয় নি। তার পরলোকগত আত্মাকে কোনভাবেই তাঁরা অসম্মান করতে চান নি, বরং শ্রদ্ধা জানাবার ব্যাপারেই হয়ত কিছুটা

উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

গিরধর এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। পলকহীন দুই রাজনৈতিক নেতাকে শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। এবার আস্তে আস্তে বললেন, 'চৌধুরীজির বডি আমরা কারো হাতেই দেব না, প্রথমে তাঁর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর সেখান থেকে শ্মশানে। কেউ যদি কোন পারপাস না নিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে চান, আমাদের আপত্তি নেই।' তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়। কথাগুলো বলেই বিকাশের দিকে ফিরলেন গিরধর, 'চল বিকাশ, ভাবীজিদের নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাক।'

তিন

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, হাসপাতালের কমপাউণ্ডে বিরাট পুলিশ ভ্যানের পেটের ভেতর হুইল চেয়ারে বসিয়েই প্রভাবতীকে তোলা হয়েছে। একেবারে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন তিনি। চোখ দুটো পুরোপুরি বোজা। ঘাড় ভেঙে মাথাটা একপাশে হেলে রয়েছে; শুকনো রক্তশূন্য ঠোঁট দুটো থরথর কেঁপেই যাচ্ছে। আধফোটা গলায় মাঝে মাঝে কিছু বলছেন প্রভাবতী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ধুকধুক করে খুব আস্তে আস্তে তাঁর বুকটা ওঠানামা করছে।

জয়া এখন আর কাঁদছে না। মায়ের কোমরটা আলতো করে জড়িয়ে ধরে স্তব্ধ মূর্তির মতো পড়ে আছে।

জয়া এবং প্রভাবতীকে ঘিরে বসে আছেন গিরধর বিকাশ এবং অনুপ।

হাসপাতাল কমপাউণ্ডে এখনও প্রচুর পুলিশ রয়েছে। মেইন গেটটা আগের মতোই বন্ধ। হাসপাতাল স্টাফ, ডাক্তার বা এই শহরের বিশিষ্ট মানুষ ছাড়া আর কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। গেটের ভিড়টা আগের চাইতে কম করে বিশ পঁচিশ গুণ বেড়ে গেছে। মহীতোষের গুলি মারার খবরটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই সারা নকীপুরে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে মাঝে মাঝেই চিৎকার উঠছিল।

'নকীপুর পুলিশ—'

'হায় হায়।'

'ডি এম সাহেব—'

'হায় হায়।'

'এস পি সাহেব—'

'হায় হায়।'

'জঙ্গলকা রাজ—'

'খতম কর।'

'বন্দুকবাজকো—'

'ফাঁসিমে চড়াও।'

এখানকার পুলিশ এবং প্রশাসন সম্পর্কে ধিক্কার এবং খুনী বন্দুকবাজদের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা এবং রাগ ফেটে পড়েছিল স্লোগানগুলোতে।

এদিকে জয়াদের তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানটা স্টার্ট দিয়েছিল। ক'জন আর্মড পুলিশ বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাইরের ভিড়টাকে সরিয়ে দিতেই বিশাল কালো গাড়িটা রাস্তায় বেরিয়ে এল।

স্লোগান দিতে দিতেই ভিড়টা সরে সরে জায়গা করে দিল। ভ্যানটা তার ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে মোড় ঘুরে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। দেখা গেল, অগুণতি মানুষ চারপাশ থেকে হাসপাতালের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বোঝা যায়, এরাও গুলির খবরটা পেয়ে দৌড়চ্ছে।

ভ্যানটা চকবাজার ডাইনে রেখে বাঁ পাশের রাস্তায় ঢুকতেই বিকাশ বলল, 'প্লীজ, গাড়িটা একটু থামান।'

ভ্যান থামলে রাস্তার ধারের একটা ওষুধের দোকান থেকে প্রভাবতীর জন্য ঘুমের ট্যাবলেট কিনে আনলো বিকাশ। পরক্ষণেই আবার গাড়িটা ছুটতে শুরু করল।

চকবাজার থেকে বাঁ দিকের রাস্তাটা সোজা মাইলখানেক গিয়ে একটা মাঝারি গোছের পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। একশো বছর আগে নকীপুরের প্রথম কলোনি ওখানেই বসেছিল। জায়গাটার নাম মিঠাপুর।

মিঠাপুরেই প্রায় আধ একর জায়গা জুড়ে মহীতোষদের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার প্রায় সারা গায়ে পুরনো ধাঁচের আর্কিটেকচারের ছাপ। মোটা মোটা থাম, চৌকো চৌকো পাথর-বসানো চওড়া চওড়া সিঁড়ি, গরাদহীন বড় বড় জানলা জুড়ে নক্সা-করা খড়খড়ি। দরজা-

গুলোও বিশাল মাপের। দরজা জানলার সঙ্গে মানানসই বিরাট বিরাট ঘর।

মহীতোষের ঠাকুরদা এবং ঠাকুরদার বাবার আমলে—নকীপুরে তখনও বিজলী বাতি আসে নি—ঘরে ঘরে টানা পাখার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য ইলেকট্রিসিটি আসার পর টানা পাখার জায়গায় ফ্যান এসেছে; ফ্যানগুলোর ব্লেড যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। গরমের সময় ওগুলো মাথার ওপর তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে চলেছে। মহীতোষ পুরনো মডেলের ফ্যানগুলো বদলাবার কথা কখনও ভাবেন নি। কাজ যখন চলেই যায়, ওগুলোকে বিদায় দেওয়ার মানে হয় না।

বাড়িটার সামনের দিকে ফুলের বাগান। পেছনে আনাজের ক্ষেত। বাগানের ভারি শখ ছিল মহীতোষের। ফি বছরই দু-একজন মালি কি মজুর জুটিয়ে এতকাল নিজের হাতে ফুল এবং শাক-সব্জির বাগান বানিয়েছেন মহীতোষ।

মিঠাপুরের সব বাড়িই মহীতোষদের বাড়ির মতোই বিরাট বিরাট কমপাউণ্ড জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব বাড়িরই সামনে পেছনে ফুলফল আনাজের বাগান। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি আর শান্ত।

পুলিশ ভ্যানটা মিঠাপুরে ঢুকতেই প্রতিটি বাড়ির লোকজন গেটের সামনে দৌড়ে আসতে লাগল। সবাই ভীষণ উৎকণ্ঠিত। মহীতোষের শেষ খবর জানার জন্য তারা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে।

ভ্যানটা যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে জানতে চায়, চৌধুরীজি বা মহীতোষদা কিংবা মহীতোষ চাচা ভাল আছেন ত? কিন্তু কোন উত্তর মেলে না। এই উত্তর না পাওয়াটাই বুঝিয়ে দেয়, অজ্ঞাত বন্দুকবাজদের গুলিতে নকীপুরের কী সর্বনাশ ঘটে গেছে। মুহূর্তে গোটা মিঠাপুর জুড়ে শোকাবহ স্তব্ধতা নেমে আসে।

মহীতোষদের বাড়িটা দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায়। তারপর থেকে শুরু হয়েছে শালবন। এখান থেকে অনেক দূরে ছোটখাট দু-একটা দেহাত।

ভ্যানটা বাড়ির কাছে আসতেই দেখা গেল, প্রকাণ্ড লোহার গেটে, মুখ চেপে বাইরে তাকিয়ে আছে মোতিয়া। বয়স প্রায় আশি পঁচাশি। গায়ের চামড়া কুঁচকে কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। চোখে ছানির সর। পরনের আধময়লা একটা শাড়ি বিহারের দেহাতী ধরনে পরা। মাথার একটু চুলও আর কালো নেই।

চোখে নিকেলের ডাঁটিওলা পুরু লেন্সের একটা গোল চশমা আছে ঠিকই কিন্তু তা দিয়ে মোতিয়া কতটুকু কী দেখতে পায় কে জানে। ভ্যানের আওয়াজ কানে আসতেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে চেঁচিয়ে উঠল; 'কৌন, বহু লৌটলি (ফিরে এলি) ?'

তিন কুলে কেউ নেই মোতিয়ার। তার বয়স যখন ষোল সতের, এ বাড়িতে কাজ করতে আসে সে, আর সে বছরই জন্মেছিলেন মহীতোষ। মোতিয়ার কোলে-পিঠে চড়েই মানুষ হয়েছেন তিনি। কেননা মহীতোষের জন্মের দু-তিন বছর বাদেই তাঁর মা মারা যান।

জ্ঞান হবার পর থেকেই মোতিয়াকে মা ডেকে এসেছেন মহীতোষ। আর মোতিয়া তাঁকে ডাকে 'বেটা'। মহীতোষ যখন প্রভাবতীকে বিয়ে করে আনেন তখন মোতিয়াই তাঁকে বরণ করে ঘরে তুলে নিয়েছিল। প্রভাবতীকে সে ডাকে 'বহু—' তারপর মহীতোষের যখন দুই মেয়ে হল, মোতিয়াই তাদের মানুষ করেছে। জয়া এবং তার দিদি ছায়া তাকে 'নানী' বলে। এ বাড়িতে বিপুল মর্যাদা মোতিয়ার। 'নানী' বা 'মা' ডাক শুধু কথার কথা না। জয়াদের কাছে সে সত্যি সত্যিই ঠাকুরমা বা মা।

মোতিয়ার প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না।

এদিকে ভ্যানটা গেটের কাছে এসে থেমে গিয়েছিল। বিকাশ নেমে এসে বলল, 'নানী, তুমি সরে দাঁড়াও। ফটক খুলব, নইলে গাড়ি ভেতরে ঢুকতে পারছে না।'

ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখে তাকাল মোতিয়া। চোখের তেজ না থাকলেও মানুষজনের কাঠামো দেখে সে খানিকটা আন্দাজ করতে পারে। তবে জানাশোনা লোক হলে

গলা শুনেই তাকে চিনে ফেলে। মোতিয়া গেট ছেড়ে একধারে সরে যেতে যেতে বলে, 'কৌন রে—বিকাশ ?'

ভারি লোহার গেটের তলায় চাকা লাগানো। ঠেলে একধারে সেটা সরিয়ে দিতে দিতে বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'বহু ফিরেছে ?' মোতিয়ার চোখেমুখে উদ্বেগ ফুটে বেরুল।

সংক্ষেপে, ভারী গলায় বিকাশ বলল, 'ফিরেছেন।'

'অসপাতালে তোরা কী দেখে এলি ? আমার বেটার কী হয়েছে ?'

বিকাশ উত্তর দিল না।

মোতিয়া রুদ্ধশ্বাসে, করুণ অসহায় মুখে বলতে লাগল, 'কী হয়েছে —বল্ না ভেইয়া, বল্ না।'

বিকাশ বলে, 'পরে শুনো।'

'বেটাকে কি তোরা অসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিস ?'

'না।'

'কখন আনবি তাকে ?'

'পরে জানতে পারবে।'

চোখে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও মোতিয়ার আশি পঁচাশি বছরের শিথিল স্নায়ু আবছাভাবে কিছু একটা যেন টের পায়। ভাঙা ভাঙা কাঁপা গলায় সে বলে, 'পরে পরে করছিস কেন ? বেটার খারাপ কিছু হয় নি ত—কি রে ?'

বিকাশ এবার আর উত্তর দেয় না।

এদিকে গেট খোলা পেয়ে পুলিশ ভ্যানটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায়, প্রভাবতীকে ধরাধরি করে দোতলায় তাঁর ঘরে এনে পুরনো আমলের বিশাল এক খাটে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ঘুমের বড়িও তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন গিরধর। চোখ দুটি এখন বোজা। খুব আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস পড়ছে। তার তালে তালে পাখির বুকের মতো পলকা বুকটা ধীরে ওঠানামা করছে। বুকের এই ধুকধুকুনিটুকু না থাকলে মনে হতো খাটের এক কোণে প্রভাবতীর মৃতদেহ

পড়ে আছে।

জয়াকে জোরজার করে বাথরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রক্তমাখা শাড়িটাড়ি বদলে একেবারে স্নান সেরে পোশাক বদলে এসে মায়ের খাটের এক কোণে বসে আছে জয়া। তার চিবুক দুই হাঁটুর ফাঁকে গোঁজা। এখন আর শব্দ করে কাঁদছে না সে। তবে চোখ দুটো টকটকে লাল। চোখের পাতা ফুলে ভারী হয়ে আছে। স্তব্ধ মূর্তির মতো দেখাচ্ছে জয়াকে।

আর মোতিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে নিস্তেজ চোখে এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অস্পষ্টভাবে সে কিছু একটু আন্দাজ করেছে ঠিকই, তবে পুরোপুরি সবটা বুঝে উঠতে পারে নি। কিছুক্ষণ আগে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বিকাশকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল কিন্তু এখন একটি কথাও আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না। তার বুকের ভেতরটা ফাটিয়ে প্রবল তোড়ে কান্না বেরিয়ে আসছে, প্রাণপণে সে সেটাকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে। ফলে ঠোঁট দুটো অসহ্য কষ্টে একটানা কেঁপে যাচ্ছে।

গিরধর অনুপ এবং বিকাশও এই ঘরেই রয়েছে। অনুপ বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে।'

কেউ উত্তর দিল না।

অনুপ আবার বলল, 'চৌধুরীজির খবরটা কি আপনাদের আত্মীয়-স্বজনদের দিতে হবে? তাঁদের ঠিকানা পেলে পুলিশের ওয়ারলেস দিয়ে জানাতে পারি।'

এ কথাটা আগে কেউ ভাবে নি বা ভাবার মতো মনের অবস্থাও কারো ছিল না। গিরধর ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'অন্যদের পরে জানালেও চলবে। তবে ছায়াকে আজই খবরটা দেওয়া দরকার।' ছায়া জয়ার দিদি। তার বিয়ে হয়েছে পাটনায়। সেখানে তার স্বামী ব্যাঙ্কের বড় অফিসার।

'তাঁর ঠিকানাটা দিন।'

বিকাশ অনুপকে বলল, 'চলুন দিচ্ছি।' গিরধরকে নিচু গলায় বলল, 'চাচাজি, আমি আমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা আর আমার ছোট বোনকে নিয়ে পাঁচ মিনিটের ভেতর ফিরে আসব।'

গিরধর তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললেন, 'তোমার মা আর বোন এলে খুব ভাল হয়। এ সময় মেয়েরা ছাড়া ভাবীজি আর জয়াকে সামলানো যাবে না।'

বাইরে যেতে যেতে বিকাশ অনুপকে ছায়াদের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দিল। জয়াদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রায় সবাইকে চেনে বিকাশ। তাদের অনেকেরই ঠিকানা এবং ফোন নম্বর তার মুখস্থ।

পাথর-বসানো টানা বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে এবার বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে আগে আর দেখি নি। আপনি কি এখানকার থানায় নতুন এসেছেন?'

অনুপ ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। এখনও দেড়মাস হয় নি।'

'তাই আলাপ হয় নি।' বিকাশ বলতে লাগল, 'থানার অন্য সবার সঙ্গে পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে ওঁরা আমাকে দিয়ে কিছু কাজও করিয়ে নেন।'

অনুপ উৎসুক হয়ে উঠল, 'কী কাজ?'

'ফোটোগ্রাফির। অনেক ক্রিমিনালের ছবি আমাকে দিয়ে ওঁরা তুলিয়েছেন।'

দ্রুত কিছু ভেবে অনুপ বলল, 'মনে হচ্ছে, চৌধুরীজির মার্ডার কেসের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হতে পারে। তখন কিন্তু আপনার সাহায্য দরকার হবে।'

'যখন ডাকবেন, আমাকে পাবেন।' গলার স্বরে জোর দিয়ে বিকাশ বলল, 'খুনীদের যেভাবে হোক, ধরতেই হবে। এদের শায়েস্তা করতে না পারলে নকীপুরের মানুষের কোন সিকিউরিটিই থাকবে না।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে অনুপ, 'ঠিক বলেছেন। এখানে

ক্রিমিনালদের সাহস যেভাবে বেড়ে গেছে, কিছু একটা করতেই হবে।' একটু থেমে ফের বলে, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, চৌধুরীজির সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।'

চোখের কোণ দিয়ে একবার অনুপকে দেখল বিকাশ। জয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা কি এই নতুন পুলিশ অফিসার আন্দাজ করতে পেরেছে? পরক্ষণেই মনে হল, সেটা সম্ভব নয়। হয়ত মহীতোষের মৃত্যুতে তার বিচলিত হওয়া, প্রভাবতীকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কিংবা জয়াদের কাউকে জিজ্ঞেস না করে ছায়ার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দেওয়া, এই সব লক্ষ্য করে ঘনিষ্ঠতার কথাটা অনুপের মাথায় এসে থাকতে পারে। বিকাশ আস্তে আস্তে বলল, 'তা আছে। তিন চার জেনারেসন ধরে আমরা এক মহল্লায় আছি।'

দূরমনস্কর মতো কিছু ভাবছিল অনুপ। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি কি জানেন—চৌধুরীজির কোন শত্রু আছে?'

বিকাশ বলল, 'ওঁর মতো মানুষের শত্রু থাকতে পারে, এ ভাবাই যায় না। হী ইজ মোস্ট রেসপেক্টেড পার্সন অফ নকীপুর। জীবনে মানুষের উপকার ছাড়া কারো ক্ষতির কথা কখনো ভাবেন নি।'

'এ সব আমি জানি। কারো কাছে ওঁর শত্রুর কথা কোনদিন কিছু শোনেন নি?'

'না।'

কথায় কথায় ওরা নিচের বাগানে চলে এসেছিল। ভ্যানে উঠতে উঠতে অনুপ বলল, 'কেসটা আমার হাতে এলে আবার আমাকে এ বাড়িতে আসতে হবে।'

'নিশ্চয়ই আসবেন।'

ভ্যানটা একটু পর গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল। আর সেটার পেছনে পেছনে গেটের দিকে আসতেই বিকাশ দেখতে পেল মৃণালিনী এবং সোনা প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে। মৃণালিনীর বয়স ষাটের

কাছাকাছি। গোলগাল ভারী চেহারা। গায়ের রং টকটকে। সোনার বয়স উনিশ কুড়ি। স্কুল-কলেজে তার নাম স্বর্ণালী। তাকে দেখতে ছোটখাটো জাপানী পুতুলের মতো। সোনা জয়াদের কলেজে পড়ে। আসছে বছর বি. এ. ফাইনাল দেবে।

কাছাকাছি এসে রুদ্ধ গলায় মৃণালিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে বুনু, যা শুনেছি তা কি সত্যি?' বিকাশের আদরের নাম বুনু।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বিকাশ। ভারী গলায় বলল, 'তোমাদের ডাকতে যাচ্ছিলাম। জয়া আর কাকীমার কাছে চল!'

মৃণালিনী আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, সোনাকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

শুধু মৃণালিনী আর সোনাই না, মিঠাপুরের আরো অনেক মহিলাই মহীতোষের বাড়ির দিকে আসছেন। যেমন ডাক্তার বেণী তালুকদারের মা আর স্ত্রী, বিষ্ণুকান্ত লাল-এর বিধবা বোন রামদুলারী, নন্দকিশোর ঝা'র মা, গিরিলাল মিশ্রর স্ত্রী—এমনি পঁচিশ তিরিশ জন। সবার চোখেমুখে বিহ্বলতার ছাপ। মহীতোষ চৌধুরীর এমন ভয়াবহ মৃত্যুর ঘটনা তাঁদের কাছে ছিল একেবারে অভাবনীয়। এঁদের সঙ্গে নিয়ে বিকাশ যখন গেটের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে সেই সময় একটা পুরনো মডেলের অস্টিন শব্দ করতে করতে এবং কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামনে এসে দাঁড়াল।

গাড়িটা বিকাশের চেনা। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহিলারা বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

গাড়ি থেকে নামলেন নকীপুরের এক-মাত্র দৈনিক 'নকীপুর সমাচার'-এর মালিক এবং সম্পাদক চতুরলাল দ্বিবেদী। বয়স পঞ্চাশের মতো। ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা মজবুত চেহারা। চৌকো মাংসল মুখ, পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পায়ে চপ্পল। মাথার চুল এত ছোট ছোট করে ছাঁটা যে চামড়া বেরিয়ে পড়েছে। পেছন দিকে মুড়নো বেঁটে টিকি। থ্যাবড়া থুতনি তাঁর,

শক্ত চোয়াল। লোকটা যে অত্যন্ত ধূর্ত, চোখের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়।

'নকীপুরের সমাচার' হিন্দি ভাষার ডেইলি। এই অঞ্চলে কাগজটার দারুণ কাটতি। চতুরলাল প্রচুর বিজ্ঞাপন পান। আট পাতা কাগজের তিন, সোয়া তিন পাতা জুড়েই বিজ্ঞাপন।

চতুরলালের সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে বিকাশের। তার অনেক ফোটো 'নকীপুর সমাচার'-য়ে বেরিয়েছে। বিকাশকে বলাই আছে, পত্রিকার উপযোগী ফোটো তুলতে পারলেই যেন চতুরলালকে দিয়ে আসে। 'নকীপুর সমাচার' থেকে ফোটোর জন্য মোটামুটি ভালই দাম পাওয়া যায়। ফোটোর সূত্রে বিকাশের সঙ্গে চতুরলালের খানিকটা অন্তরঙ্গতা হয়েছে।

বিকাশের কাছে দ্রুত এগিয়ে এসে চতুরলাল বললেন, 'এ কি ব্যাড নিউজ বিকাশ! খবরটা শুনে আমি ত বিলকুল ঘাবড়েই গেছি। আমার হার্ট বীট বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। ডাক্তারের কাছে গিয়ে দুটো গোলি খেয়ে তবে স্টেডি হতে পেরেছি। তারপরই এখানে দৌড়ে এলাম। এখনও কিরকম পসিনা (ঘাম) বেরুচ্ছে দেখ—' বলে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

চতুরলাল একটু বেশিই কথা বলেন। তবে তিনি যে প্রচুর ঘামছেন, সেটা আদৌ মিথ্যে নয়।

চতুরলাল ফের বললেন, 'চৌধুরীজির মতো ফ্রীডম-ফাইটার আর সমাজসেবীকে যদি এভাবে খুন হতে হয় তা হলে বুঝতে হবে আমরা জানোয়ার হয়ে গেছি। এটা আর মানুষের সোসাইটি নেই।'

বছর পনের আগে, তখনও 'নকীপুর সমাচার' বেরুতে শুরু করে নি, চতুরলাল দ্বিবেদী ছিলেন একটা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। উত্তেজিত বা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলে তাঁর কথায় ক্লাশ-লেকচারের ঢং এসে যায়। যাই হোক, এ জাতীয় কথা আরো অনেক বার শুনেছে বিকাশ। সে এবারও কিছু বলল না।

চতুরলাল বললেন, 'চৌধুরীজির খুনের ব্যাপারটা আমার পত্রিকায় ভাল করে কভার করতে চাই। তাঁর নানা বয়সের কিছু ফোটো দরকার। বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার ফোটো, ফর্টি-টু আগস্ট মুভমেন্টের সময় জেল খাটার ফোটো, ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিছিল আর মিটিং করার সময়কার ফোটো, আর তাঁর ডেডবডির একটা ফোটো।' বিকাশের সঙ্গে মহীতোষদের সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ চতুরলাল তা জানেন।

বিকাশ মহীতোষের নানা বয়সের নানা সময়ের বেশ কিছু ছবি আগেই যোগাড় করে একটা বড় অ্যালবামে সাজিয়ে রেখেছে। সে বলল, 'সব ফোটোই দিতে পারব। শুধু একটা বাদ।'

চতুরলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনটা?'

'ডেডবডির। পুলিশ এবং হসপিট্যাল অথরিটির পারমিসান নিয়ে ঐ ফোটোটা আপনাকে কোন ফোটোগ্রাফার দিয়ে তোলাতে হবে।'

'পারমিসান পেতে অসুবিধা হবে না। তুমি ফোটোটা তুলে দেবে?'

'আমার পক্ষে এখান থেকে আজ আর বেরুনো সম্ভব না চতুরলালজি।'

চতুরলাল ভাবলেন, চৌধুরীজি খুন হয়ে যাওয়াতে তাঁর বাড়ির লোকেরা যে প্রচণ্ড 'শক' পেয়েছেন তাতে তাঁদের সামলাবার জন্য বিকাশের মতো একজনের ওঁদের কাছে থাকা দরকার। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এখানেই থাকো।' এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রভাবতী এবং জয়ার খবর নিলেন চতুরলাল, মহীতোষের আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ এসেছেন কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে জরুরী কাজের কথাও বলতে লাগলেন। জন্ম থেকে আজ এই খুন হওয়া পর্যন্ত মহীতোষের জীবনের একটা শর্ট লাইফ হিস্ট্রি দরকার। কাল 'নকীপুর সমাচার'-এর মর্নিং এডিসানে নৃশংস হত্যার ঘটনার সঙ্গে মহীতোষের গৌরবময় মহৎ জীবনের ইতিহাসও বার করা হবে।

বিকাশ জানে, জয়া মহীতোষের জীবনের ধারাবাহিক বিভিন্ন ঘটনা অনেক দিন আগেই লিখে রেখেছে। তার ইচ্ছা একটা বই করবে। কিন্তু মহীতোষের আপত্তির কারণে ওটা ছাপা যায় নি। তাঁর মতে দেশের স্বাধীনতার কারণে বা পরে মানুষের কল্যাণে যা যা করেছেন, ঢাক ঢোল পিটিয়ে সে সব প্রচার করার মানে হয় না।

ভারতবর্ষের একজন মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্যটুকু শুধু পালন করে গেছেন, তার বেশি কিছু নয়।

বিকাশ বলল, 'লাইফ হিস্ট্রি তৈরি করাই আছে। ওটা ছোট করে দিতে হবে। সন্ধ্যেবেলা কাউকে পাঠিয়ে দিলে পেয়ে যাবেন।'

'আর ফোটোগুলো?'

'তখনই দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' বলেও চলে গেলেন না চতুরলাল। তাঁর আরো কিছু বলার আছে।

বিকাশ বলল, 'আমি এবার ভেতরে যাব। আপনি কি আর কিছু বলবেন?'

আস্তে মাথা নাড়লেন চতুরলাল। গলা খাকরে বললেন, 'আমি একটা খবর পেয়েছি—' কথাটা শেষ না করে তিনি থেমে গেলেন।

'কী খবর?'

'মার্ডারাররা যখন মহীতোষের ওপর গুলি চালায় সেই সময় অটো রিকশায় তাঁর পাশে তাঁর মেয়ে জয়াও ছিল।'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'আমি চৌধুরীজির মেয়ের একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।'

'কিসের ইন্টারভিউ?'

'প্লেস অফ অকারেন্সে কী কী ঘটেছিল, অ্যাটমসফীয়ারটা কেমন ছিল, মার্ডারাররা কোন দিক থেকে এসেছে, জয়া তাদের চিনতে পেরেছে কিনা—এই সব আর কি। ঘটনাটা এত সীরিয়াস যে অন্য রিপোর্টারদের না পাঠিয়ে নিজেই চলে এসেছি।'

বিকাশ অস্বস্তি বোধ করল। বিব্রতভাবে বলল, 'কিন্তু এখন জয়ার যা মানসিক অবস্থা, ওকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না।'

চতুরলাল বললেন, 'আমি বুঝি। কিন্তু নিউজ পেপারের ব্যাপার ত। যতটা বেশি এক্সক্লুসিভলি কভার করা যায়। ওর কাছে এমন কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে যা থেকে পুলিশ মার্ডারারদের খুঁজে বার করতে পারবে।'

'ক্ষমা করবেন চতুরলালজি।' বিকাশ বলতে লাগল, 'জয়া এত ভেঙে পড়েছে যে এ সময় ওর পক্ষে ইন্টারভিউ দেওয়া একেবারেই সম্ভব হবে না।'

একটু চুপ করে রইলেন চতুরলাল। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তবে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী?'

'চৌধুরীজির মেয়ে আমার আগে অন্য নিউজপেপারকে যেন ইন্টারভিউ না দেয়। এটা আমার রিকোয়েস্ট।'

'নকীপুর সমাচার' ছাড়া এখান থেকে আর কোন দৈনিক পত্রিকা বেরোয় না। তবে একটা ইংরেজি, তিনটে হিন্দি এবং একটা বাংলা উইকলি আছে। তাছাড়া পাটনা দিল্লী বম্বে এবং কলকাতার অনেকগুলো ডেইলি কাগজের করেসপনডেন্ট রয়েছে এখানে।

চতুরলালের মাথায় নিজের কাগজের ইন্টারেস্ট এবং অন্য সব পত্র-পত্রিকার করেসপনডেন্টদের ভাবনাটা কাজ করে যাচ্ছিল। জয়া মহীতোষ চৌধুরীর মেয়ে এবং হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। তার মুখ থেকে এই খুনের ঘটনার বিবরণ যে আগে যোগাড় করতে পারবে, তার কম করে বিশ হাজার কপি এক্সট্রা সেল কেউ ঠেকাতে পারবে না। চতুরলাল মনে মনে স্থিরই করে রেখেছেন এই খুনের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর কাগজের সার্কুলেসন বাড়িয়ে ফেলবেন। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা আকছার ঘটে না। কিন্তু কাগজের পক্ষে এগুলো সত্যিকারের 'মীট'। সেনসেসান এবং উত্তেজনা ছাড়া মানুষ আজকাল আর কিছু চায় না। চতুরলালের ভয় অন্য কাগজ জয়ার ইন্টারভিউ আগে পেয়ে

গেলে 'নকীপুর সমাচার' ডাহা মার খেয়ে যাবে।

বিকাশ বলল, 'জয়া যদি ইন্টারভিউ দিতে রাজী হয়, প্রথমে আপনার সঙ্গে কথা বলবে।'

'জবান দিলে কিন্তু—' বিকাশের দু হাত জড়িয়ে বেশ অনুনয়ের ভঙ্গিতেই বললেন চতুরলাল।

'হ্যাঁ।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই অন্য সব কাগজের করেসপনডেন্টরা ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে এসে হাজির। তারাও জয়া এবং প্রভাবতীর ইন্টারভিউ চাইছে, দু'জনের ফোটোও তুলবে। তাছাড়া মহীতোষের পুরনো দিনের ছবি এবং তাদের লাইফ হিস্ট্রিও তাদের দরকার।

বিকাশ জানালো, কোনভাবেই প্রভাবতী এবং জয়ার পক্ষে এখন ইন্টারভিউ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সন্ধ্যেবেলা এলে মহীতোষের কিছু ফোটো এবং লাইফ হিস্ট্রি পাওয়া যাবে। ইন্টারভিউর জন্য স্থানীয় সংবাদদাতারা এবং এখানকার সাপ্তাহিকগুলোর রিপোর্টাররা বিকাশের প্রায় পায়ে ধরতে বাকি রাখল কিন্তু তাকে একেবারেই টলানো গেল না।

যতক্ষণ অন্য কাগজের লোকেদের সঙ্গে বিকাশ কথা বলছিল, একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন চতুরলাল। লক্ষ্য রাখছিলেন, বিকাশ অন্য কাউকে জয়ার ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দেয় কিনা।

বিকাশকে রাজী না করাতে পেরে ব্যর্থ করসেপনডেন্টরা একে একে ফিরে যেতে লাগল। সবার শেষে চতুরলাল দ্বিবেদী তাঁর পুরনো মডেলের অস্টিন গাড়িটায় স্টার্ট দিলেন।

আর বিকাশ দ্রুত বাড়ির ভেতর চলে গেল। এখন তার অনেক কাজ। প্রথমে জয়ার কাছ থেকে মহীতোষ চৌধুরীর লাইফ হিস্ট্রিটা নিয়ে কাটছাঁট করে কয়েক কপি টাইপ করাতে হবে। তারপর নিজেদের বাড়ি গিয়ে মহীতোষের ফোটোর কটা প্রিন্ট তৈরি করবে। বাড়িতে তার নিজস্ব ডার্করুম আছে।

চার

পরের দিন সকালে 'নকীপুর সমাচার' পুরো দু পাতা জুড়ে মহীতোষের নানা সময়ের অসংখ্য ছবি, তাঁর দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং শোচনীয় মৃত্যুর খবর ছেপে বার করল। শুধু তাই না, হাসপাতাল অথরিটি এবং পুলিশের অনুমতি নিয়ে আহত অটো রিকশাওলার একটা ইন্টারভিউও ছেপেছে। তা ছাড়া রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, স্থানীয় বিধায়ক রামনেহাল দুবে, নির্বাচনে পরাজিত জননেতা হরকিষণ শাস্ত্রী, অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টির নকীপুর শাখার সভাপতি বা সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, ইত্যাদি বিশিষ্ট মানুষদের শোক-বার্তা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি ছেপেছে। মহীতোষের এমন ভয়াবহ মৃত্যুতে তাঁরা যেমন অভিভূত তেমনি বিচলিতও। সবাই তীব্র ভাষায় এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন।

'নকীপুর সমাচার' ছাড়াও এখানে যে ক'টা সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকা আছে, তারাও রাতারাতি মহীতোষের জীবনী এবং অজ্ঞাত হত্যাকারীর গুলিতে তাঁর মৃত্যুর খবর দিয়ে বিশেষ এডিসান বার করেছে। তবে এই পত্রিকাগুলো অটো-রিকশাওলার ইন্টারভিউ বা রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য জননেতাদের শোকোচ্ছ্বাস যোগাড় করতে পারে নি। বিভিন্ন মহলে চতুরলালের যা প্রভাব এবং যোগাযোগ সেটা তাদের নেই। অবশ্য সবগুলো কাগজই সম্পাদকীয়তে এই জঘন্য হত্যার নিন্দা করেছে।

পত্রিকাগুলো ছাড়াও সকালে আকাশবাণী দিল্লী থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে খবর পড়া হয় তাতে এই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ এর মধ্যেই মহীতোষের মৃত্যুর খবর পেয়ে গেছে।

বেলা একটু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতী এবং জয়ার কাছে শোক এবং সমবেদনা জানিয়ে নানা জায়গা থেকে টেলিগ্রাম আর ফোন আসতে লাগল। আর আসতে লাগল নকীপুরের মানুষ। বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তারা সহানুভূতি জানাতে লাগল। তা ছাড়া মহল্লার লোকজন ত অনবরত আসছেই।

প্রভাবতী এখনও আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তবে আর কাঁদছেনও না। স্তব্ধ একটা মূর্তির মতো বিশাল খাটের এক ধারে পড়ে আছেন। খুব আস্তে আস্তে, তির তির করে তাঁর সমতল বুক ওঠানামা করছে।

জয়া আজ কিছুটা শান্ত, তার বিহ্বলতা অনেকটাই কেটে গেছে। সে বুঝেছে, একেবারে ভেঙে পড়লে তার চলবে না। অন্তত মায়ের জন্য তাকে শক্ত হতে হবে। নইলে মাকে বাঁচানো যাবে না। তা ছাড়া শোকের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কমে যাবার পর এখন তার মাথার ভেতর টগবগ করে যা ফুটছে তা হল অসহ্য রাগ এবং জেদ। মহীতোষের মতো সং নিঃস্বার্থ দেশব্রতী মানুষকে যারা এভাবে খুন করেছে তাদের কোনভাবেই ছেড়ে দেবে না জয়া। এই ঘাতকদের যাতে চরম শাস্তি হয়, সে জন্য সারা পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলবে।

মোতিয়া কিন্তু ঘরের এককোণে হাঁটুতে মুখ গুঁজে আধফোটা শব্দ করে একটানা কেঁদেই চলেছে।

কাল সেই যে গিরধর সোনা আর মৃণালিনী এ বাড়িতে এসেছিলেন তাঁরা আর ফিরে যান নি। সিডেটিভের ঘোর কেটে গেলে জেগে উঠেছিলেন প্রভাবতী, আর উঠেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তাঁর শরীরের যা হাল তাতে আবার কড়া ঘুমের ট্যাবলেট দিতে সাহস হয় নি।

সমস্ত রাত প্রভাবতী, সেই সঙ্গে জয়া আর মোতিয়া সমানে কেঁদেছে। সোনা গিরধর এবং মৃণালিনী তাদের পাশে বসে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সামলেছেন। বিকাশ একবার এ বাড়িতে এসেছে, আবার নিজেদের বাড়ি

গেছে। তার বাবা রমানাথ এসে মাঝরাত পর্যন্ত এখানে থেকে নিজেদের বাড়ি চলে গেছেন। আবার ভোর হতে না হতেই ফিরে এসেছেন।

এখন গিরধর রমানাথ এবং বিকাশ পালা করে ফোন ধরছেন, যে সব লোকজন সহানুভূতি জানাতে আসছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। পিওনরা টেলিগ্রাম নিয়ে এলে সই করে রিসিভ করছেন। মহিলারা এলে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন মৃণালিনী এবং সোনা। অবশ্য খুব ঘনিষ্ঠ না হলে পারতপক্ষে কাউকেই প্রভাবতী বা জয়ার কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

ঘড়ির কাঁটায় যখন সাড়ে আটটা সেই সময় গিরধর রমানাথ এবং বিকাশকে একধারে ডেকে নিয়ে নীচু গলায় বললেন, 'বেশ বেলা হয়ে গেল। হাসপাতালে ফোন করে জেনে নেওয়া দরকার, ওরা কখন ডেড বডি রিলিজ করবে। খাট, ফুল, নতুন কাপড়চোপড় কিনতে হবে। চৌধুরীজির মতো মানুষকে ত এমনি এমনি নিয়ে যাওয়া যাবে না, ভাল করে সাজিয়ে শ্মশানে নিতে হবে। তাঁর শেষ যাত্রাটা যেন সুন্দর হয়।' বলতে বলতে দীর্ঘকালের সংগ্রামের সঙ্গী মানুষটির জন্য গিরধরের চোখ জলে ভরে যেতে লাগল। গলার স্বর শেষ দিকে বুজে এল।

মহীতোষের অন্তিম যাত্রা এবং তাঁর নশ্বর দেহের শেষ পরিণতির কথা আগে কেউ ভাবে নি। কিন্তু গিরধরের সেদিকে লক্ষ্য আছে। বিকাশ এবং রমানাথ খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিকাশ বলল, 'আমি এখনই হাসপাতালে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।' বলেই পাশের ঘরে চলে গেল। ওখানেই ফোনটা রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বিকাশ বলল, 'ঠিক এগারোটায় ডেড বডি ছেড়ে দেবে। আমাদের সেই সময় যেতে বলেছে। এখনও দু আড়াই ঘণ্টার মতো সময় আছে। আমি এর মধ্যে খাট-টাট কিনে নিয়ে আসি।'

বিকাশ যখন বেরুতে যাবে সেই সময় খাট থেকে নেমে এল জয়া। বলল, 'শোন—'

বিকাশ মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ। খাট ফুলটুলের জন্য টাকা নিয়ে যাও।'

জয়া যে তাদের কথা সবই শুনেছে, বিকাশ ভাবতে পারে নি। বিব্রতভাবে সে বলল, 'ও নিয়ে তোমাকে এখন ভাবতে হবে না।'

'তা হয় না।' ঘরের আরেক ধারে বিরাট মাপের পুরনো আলমারি রয়েছে। জয়া সোজা সেখানে গিয়ে আলমারি খুলে এক হাজার টাকা এনে বিকাশকে দিল, 'এতে যদি না কুলোয়, চেয়ে নিও।' বলেই আবার খাটে গিয়ে বসল।

বিকাশ আর দাঁড়াল না। একা তার পক্ষে এত জিনিস আনা সম্ভব না, পাড়ার ক'টা ছেলেকে সঙ্গে নিতে হবে।

গিরধর রমানাথকে জানালেন, শ্মশানে একজন পুরোহিত দরকার হবে। তা ছাড়া চৌধুরীজিকে অন্তিম যাত্রায় নিয়ে যাবার জন্যে একটা লরীও প্রয়োজন।

'আমি দেখছি।' বলে রমানাথও বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টাদেড়েক বাদে ফুল এবং খাট-টাট কিনে ফিরে এল বিকাশ। এর মধ্যে রমানাথ একজন পুরোহিত যোগাড় করে এনেছেন। সেই সঙ্গে লরীর ব্যবস্থাও করেছেন।

গিরধর বিকাশ এবং রমানাথ, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলেন, ডেড বডি নিয়ে তাঁরা প্রথমে বাড়ি আসবেন। এখান থেকে জয়াকে লরীতে তুলে, শহর ঘুরিয়ে শ্মশানে যাওয়া হবে। সারা নকীপুর চৌধুরীজিকে শেষ দর্শনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তারপর বিকেল নাগাদ মহীতোষের শব চিতায় তোলা হবে। এর মধ্যে যদি ছায়ারা পাটনা থেকে এসে না পৌঁছুতে পারে, জয়াই তার বাবার মুখাগ্নি করবে। তবে কোনক্রমেই প্রভাবতীকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে না।

তাঁর শরীর এবং মনের যা অবস্থা তাতে জ্বলন্ত চিতায় স্বামীকে পুড়ে শেষ হয়ে যেতে দেখলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। মোতিয়াকেও নেওয়া হবে না। সে যেভাবে ভেঙে পড়েছে তাতে তার পক্ষে শ্মশানের দৃশ্য না দেখাই ভালো। মৃণালিনা সোনা এবং মিঠাপুরের অন্য মহিলারা তাদের কাছে থাকবেন।

বিকাশরা যখন বেরুতে যাবে, অনুপ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দোতলায় উঠে এল। তার চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা। সেই যে কাল সে প্রভাবতীদের পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার তাকে এই দেখা গেল।

অনুপ বলল, 'আপনারা এখনই আমার সঙ্গে চলুন। নইলে চৌধুরীজির ডেড বডি হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

সবাই চমকে উঠল। গিরধর উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'কী বলছেন আপনি! হাতছাড়া হবে মানে!'

অনুপ ব্যাপারটা এভাবে বুঝিয়ে দিল। এখানকার দুটো বড় এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল প্রচুর লোকজন ফুল ট্রাক মালা ঝাণ্ডা ফেস্টুন ইত্যাদি নিয়ে সকালেই হাসপাতালে এসে হাজির হয়েছে। একদলের নেতা এম এল এ রামনেহাল দুবে, অন্য দলের নেতা হরকিষণ শাস্ত্রী। দুই দলই চাইছে ডেড বডি নিয়ে তারা আলাদাভাবে প্রসেসন বার করবে। রামনেহালের দাবি, চৌধুরীজির শব তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে। হরকিষণও তা-ই চাইছেন। দু পক্ষের ওয়ার্কারদের মধ্যে বেশ কয়েক বার মারপিটও হয়ে গেছে এই নিয়ে। হাসপাতালের সামনে এখন প্রচণ্ড টেনসান চলছে। পুলিশ কোনরকমে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। দুই পলিটিক্যাল পার্টিই এখানে সমান পাওয়ারফুল। পুলিশের পক্ষে কোন দলকেই খুশি করা সম্ভব না। তাদের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো। কড়া অ্যাকসান নিয়ে পার্টি ওয়ার্কারদের যে হটিয়ে দেবেন তার উপায় নেই। কোনরকমে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই মুহূর্তে বিকাশরা

যদি না যায়, পার্টির ওয়ার্কাররা গেট ভেঙেই হয়ত ডেড বডি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

বিকাশ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'একটা ডেড বডির জন্যে ওরা এত ঝামেলা করছে কেন?'

অনুপ উত্তর দিল না, চোখ কুঁচকে সামান্য হাসল।

গিরধর একটু ভেবে বললেন, 'বুঝতে পারছ না?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল বিকাশ।

গিরধর এবার যা বললেন তা এই রকম। মাস পাঁচেক পরেই আবার নতুন নির্বাচন আসছে। তাই এখন থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের গ্রাউণ্ড-ওয়ার্ক করে রাখতে চাইছে। মহীতোষ চৌধুরীর শব ফুলে মালায় সাজিয়ে হাজার হাজার পার্টি-ওয়ার্কার দিয়ে মিছিল করিয়ে শ্মশানযাত্রার জন্য এই যে ছুটো রাজনৈতিক দল ক্ষেপে উঠেছে তার পেছনে শোকের ব্যাপারটা নেই বললেই হয়। সেখানে উদ্দেশ্য একটাই। জনগণকে তারা বোঝাতে চায়, মহীতোষের মতো সৎ আদর্শবান শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা-সংগ্রামী তাদের সঙ্গেই বরাবর ছিলেন, নইলে এই শোক-যাত্রার অধিকার তারা পেল কী করে? এই অঞ্চলে কেউ যদি কোন-ক্রমে মহীতোষের নামটা কাজে লাগাতে পারে, লোকের ধারণা হবে সে-ও বুঝি আদর্শবাদী এবং নিঃস্বার্থ। তার গায়ে তৎক্ষণাৎ সততা এবং মহত্ত্বের স্ট্যাম্প পড়ে যাবে। এই সততা এবং মহত্ত্বের স্ট্যাম্পটার দিকেই এখানকার ছুই পলিটিক্যাল পার্টির একমাত্র লক্ষ্য। শ্মশানযাত্রার কল্যাণে লোককে যদি দেখানো বা বোঝানো যায় মহীতোষ তাঁদের আপনজন, তা হলে পার্টির ইমেজ অনেক গুণ বেড়ে যাবে। তাতে পাঁচ মাস পরের নির্বাচনে জেতার রাস্তাটা অনেকখানিই মসৃণ হয়ে উঠবে। স্বাধীনতার পর কোন রাজনৈতিক দলই মহীতোষকে কাছে টানতে পারে নি। জীবিত অবস্থায় না পারলেও মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে।

বিকাশ হতবাক। একটি মৃত মানুষের শব দখল করার পেছনে যে

এমন জটিল প্যাঁচালো ব্যাপার আছে, সে ভাবতে পারে নি।

গিরধর তাঁর কথা শেষ করে তাড়া দিলেন, 'আর দেরি করা ঠিক হবে না। ওদিকে হাসপাতালে কী হচ্ছে কে জানে।'

ঠিক হল, গিরধর আর রমানাথ পুরোহিত এবং এ পাড়ার লোকজন নিয়ে ভাড়া-করা লরীটায় হাসপাতালে যাবেন। তাতে খানিকটা সময় লাগবে। তার আগেই বিকাশ অনুপের সঙ্গে তার জীপে চলে যাবে।

একটু পর দেখা গেল, দারুণ স্পীডে অনুপ তার জীপটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাশে বসে আছে বিকাশ।

অনুপ বলল, 'আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি।'

অন্যমনস্কর মতো উইণ্ডস্ক্রীনের বাইরে তাকিয়ে ছিল বিকাশ। কাল থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটে যাচ্ছে, সব যেন অবিশ্বাস্য এক রহস্য-নাটকের মতো মনে হচ্ছে। অনুপের কথায় মুখ ফিরিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর?'

'চৌধুরীজির মার্ডার কেস ডিটেকসানের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।'

বিকাশ উৎসুক হয়ে উঠল। বলল, 'খুব ভাল খবর। আশা করি খুনীদের খুঁজে বার করতে পারবেন।'

'আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর বিকাশ বলল, 'এরকম জঘন্য ক্রাইম কারা করল, কিছু বুঝতে পারছেন?

অনুপ বলল, 'ইট'স টু আর্লি। তবে কাল বিকেলে চৌধুরীজির বাড়ি থেকে ফিরে দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুনের জায়গায় ছুটি। ট্রেন্‌ড্‌ কুকুর নিয়ে গিয়েছিলাম। কুকুর ছুটো রাস্তায় ধুলো শুঁকতে শুঁকতে ডানদিকের গলিতে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে।'

খুবই কৌতূহল হচ্ছিল বিকাশের। বলল, 'দাঁড়িয়ে পড়ল কেন?'

'খুনীদের মোটর বাইক তারপর কোনদিকে গেছে সেটা ট্রেস করতে পারে নি।'

'কেন?' বিকাশের চোখেমুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল।

খুনীরা চলে যাবার পর ওই রাস্তায় আরো অনেক গাড়ি টাড়ি আর মানুষ গেছে। খুনীদের মোটর বাইকের দাগ পরের গাড়িগুলোর টায়ার আর মানুষের পায়ের ছাপের তলায় চাপা পড়ে গেছে। মোটর বাইকের দাগটা ওরা যতদূর খুঁজে পেয়েছিল ততদূর গিয়েই ওরা থেমে যায়।'

'তা হলে কি খুনীদের ধরা যাবে না?' বিকাশের উৎকণ্ঠা আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

'নিশ্চয়ই যাবে। কুকুরেরা পারে নি বলে মানুষ পারবে না, এমন কোন কথা নেই। আপনাকে জানিয়ে রাখি, মোটর বাইকের নাম্বারটা পাওয়া গেছে।'

'পাওয়া গেছে!' প্রায় চেঁচিয়েই উঠল বিকাশ, 'তা হলে ত—'

হাত তুলে বিকাশকে থামিয়ে দিল অনুপ, 'ব্যাপারটা এত সিম্পল নয়। আপনি ভাবছেন, নাম্বার প্লেট যখন পাওয়া গেছে তখন মোটর ভেহিক্যালস ডিপার্টমেন্ট থেকে মালিকের নাম বার করে মার্ডারারদের ধরা যাবে—এই ত?'

'নিশ্চয়ই।'

অনুপ হাসল, 'যদি নাম্বার প্লেটটা ফল্‌স্ হয়? কিংবা কারো মোটরবাইক চুরি করে ওরা যদি খুন করে গিয়ে থাকে? তা হলে মালিককে হয়ত ধরা যাবে কিন্তু সে ত আর মার্ডারার না।'

এদিকটা ভেবে দ্যাখে নি বিকাশ। আস্তে আস্তে সে বলল, 'তা হলে ব্যাপারটা খুবই কমপ্লেক্স হয়ে উঠবে।'

'তা একটু উঠবে বৈকি। খুনীরা কি ধরা পড়বার জন্যে আগেভাগে সব রকম ক্লু সাজিয়ে রেখে খুন করতে বেরোয়? তেমন হলে পুলিশের নাইনটি নাইন পারসেন্ট কাজই কমে যেত। পুলিশের এমন উপকারী ক্রিমিনালের কথা আমার জানা নেই।' বলতে বলতে একটু থামল অনুপ। কি ভেবে পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'অবশ্য খুনের ইনসিডেন্টটার সময় ধারে কাছে যারা ছিল, এমন প্রায় ষাট সত্তর জনের

সঙ্গে কথা বলে কিছু কিছু ক্লু পাওয়া গেছে।'

এবার বেশ উৎসুক দেখাল বিকাশকে। অনুপের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিরকম ক্লু?'

'তা এখন বলা যাবে না। ওটা সিক্রেট। ক্লু'র খবর জানাজানি হয়ে গেলে মার্ডারাররা সাবধান হয়ে যাবে। ক্রাইমের এভিডেন্স লোপাট করে দেবার চেষ্টা করবে।'

'তা হলে বলার দরকার নেই।'

কিছুক্ষণের মধ্যে অনুপের জীপ হাসপাতালে পৌঁছে গেল।

পাঁচ

হাসপাতালের গেট বন্ধ। সেখানে হেলমেট-পরা পঞ্চাশ ষাট জন আর্মড পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে, কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

বাইরের রাস্তায় কম করে হাজার চার পাঁচেক লোক সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে। তাদের অনেকেরই হাতে নানা রাজনৈতিক দলের ফ্ল্যাগ। তবে দুটো পলিটিক্যাল পার্টির ফ্ল্যাগ বিশেষ করে চোখে পড়ছে।

এরা সবাই গলা ফাটিয়ে জানাচ্ছে, মহীতোষ চৌধুরীর শব তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই এক দাবি

ভিড়ের ভেতর রাস্তা করে নিয়ে অনুপের জীপ হাসপাতালের কমপাউণ্ডে ঢুকে পড়ল। গাড়িটা একধারে পার্ক করে প্রথমে অনুপ নামল, তারপর বিকাশ। একটু পর দু'জনে হাসপাতালের মেইন বিল্ডিংয়ে গিয়ে সোজা দোতলায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল।

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে রমানাথ এবং গিরধররা লরী নিয়ে হাসপাতালে এলেন।

এগারটা নাগাদ মহীতোষ চৌধুরীর কাটা-ছেঁড়া-করা নিষ্প্রাণ দেহ ফুল মালা চন্দন এবং নতুন পোশাকে সাজিয়ে, নতুন দামী খাটে শুইয়ে লরীতে তোলা হল। খাটটাকে ঘিরে বসলেন রমানাথ গিরধর বিকাশ এবং তাদের মহল্লার লোকজন।

কিছুক্ষণ পর লরীটা বাইরে বেরিয়ে এল। তার পেছন পেছন পুলিশের একটা ভ্যান। সেই ভ্যানে রয়েছে জনকয়েক আর্মড পুলিশ এবং অনুপ। যেখানে এতগুলো রাজনৈতিক দলের কর্মী মহীতোষ চৌধুরীর মৃতদেহের দাবিদার সেখানে দুর্ঘটনা ঘটবার যথেষ্ট কারণ থাকে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাই পুলিশের ভ্যান সঙ্গে যাচ্ছে।

মহীতোষের নশ্বর শরীর নিয়ে লরীটা বাইরের রাস্তায় আসতেই চারিদিক থেকে চিৎকার উঠল।

'হত্যারাকো—'

'ফাঁসি পর চড়াও।'

'মহীতোষজি —'

'অমর রহে।'

লরীটা কোন কোন রুট ধরে গিয়ে কোথায় কোথায় থেমে শেষ পর্যন্ত শ্মশানে পৌঁছুবে তার একটা ছক মোটামুটি ঠিক করেই রেখেছিল বিকাশরা। প্রথমে লরীটা যাবে এখানকার অনাথ শিশুদের কল্যাণ আশ্রমে, সেখান থেকে দুঃস্থ নারীদের সেবা প্রতিষ্ঠান, কয়লা খাদানের পাশে শ্রমিকদের ঝুপড়ি, ইত্যাদি নানা জায়গা ছুঁয়ে বাড়ি যাবে, সেখান থেকে জয়াকে তুলে শ্মশানে। এর মধ্যে পাটনা থেকে ছায়ারা যদি এসে যায়, তাহলে তাদেরও তুলে নেওয়া হবে।

লরীটা ডাইনে ঘুরে চক বাজারের দিকে এগিয়ে যায়। পলিটিক্যাল পার্টির কর্মীরা স্লোগান দিতে দিতে সেটার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে। এরা ছাড়া নকীপুরের সাধারণ মানুষজনও দু'ধারের বাড়িঘর দোকানপাট থেকে বেরিয়ে এসে শোকযাত্রার সঙ্গে মিশে যায়। প্রতি দশ মিনিটে শোকমিছিল পঞ্চাশ গজ করে বেড়ে যেতে থাকে।

স্লোগান টোগান দিলেও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কোনরকম ঝামেলা টামেলা বাধায় নি, বরং বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছিল। কিন্তু চক বাজারের মোড় ঘুরে লরীটা একশো গজও যায় নি, আচমকা হরকিষণ শাস্ত্রীর দলের লোকেরা মিছিল ভেঙে লরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পঁচিশ তিরিশ জন লাফিয়ে লরীতে উঠে পড়ল। ড্রাইভারকে জোর করে নামিয়ে একজন স্টীয়ারিং ধরে বসল। বাকি সবাই লরীটাকে তিন দিক থেকে ঘিরে নিয়ে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে লাগল।

'চৌধুরীজি—'

'জিন্দাবাদ।'

'চৌধুরীজি—'

'অমর রহে।'

'চৌধুরীজিকা আশীর্বাদ কিসনে পায়া?'

'হরকিষণ শাস্ত্রীনে।'

'আগামী চুনাওমে কৌন জিতেগা?'

'শাস্ত্রীজি—শাস্ত্রীজি—'

এরপর তারা যা বলতে লাগল তা এইরকম। মহীতোষ নাকি হরকিষণ শাস্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন, আগামী নির্বাচনে তিনি হরকিষণকে সাপোর্ট দেবেন, তাঁদের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনাটা এত দ্রুত এবং আচমকা ঘটে গেছে যাতে অন্য সব রাজনৈতিক দলের লোকেরা এবং সাধারণ মানুষজন একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল। হরকিষণের লোকেরা যে ভেতরে ভেতরে এমন একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বসে আছে, আগেভাগে কেউ আঁচ পর্যন্ত করতে পারে নি।

বিমূঢ় ভাবটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কেটে গেল। তারপরেই রামনেহাল দুবের পার্টি-কর্মীরা লরী দখলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যে কদর্য খিস্তি এবং বাছা বাছা গালিগালাজের আদানপ্রদান শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গে হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে, কাঠের টুকরো, ভাঙা ইট, খোয়া—পাগলের মতো ছুঁড়তে লাগল। কত লোকের যে মাথা ফাটল, হাত-পায়ের হাড় ভাঙল, তার হিসেব নেই। রক্তের স্রোত বয়ে যেতে লাগল চক বাজারের রাস্তায়। দুই তরফেরই দাবি—মহীতোষ চৌধুরী তাদেরই, তাঁর শব নিয়ে অন্তিমযাত্রার অধিকার তাদের ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না।

মারদাঙ্গা শুরু হওয়াতে নকাপুরের খুব সাধারণ যে সব মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল, প্রাণ বাঁচাতে উর্ধ্বশ্বাসে এধারে ওধারে ছুটতে লাগল। মুহূর্তে শোকযাত্রার গাম্ভীর্য বিষাদ এবং মর্যাদা ধ্বংস করে

একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার ঘটে যায়।

এ সবের মধ্যেই দুই রাজনৈতিক দল পরস্পরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে স্লোগান দিতে থাকে।

'রামনেহাল দুবে—'

'মুর্দাবাদ।'

'হরকিষণ শাস্ত্রী—'

'মুর্দাবাদ।'

এদিকে লরীটা থেমে গিয়েছিল। খোয়া আর ইটের ঘায়ে উইণ্ড স্ক্রীনের কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

বিকাশ রমানাথ এবং তাদের পাড়ার লোকজনেরা একেবারে হকচকিয়ে গেছে। মারাত্মক ভয়ও পেয়েছে তারা। মহীতোষ চৌধুরীর মতো সম্মানিত মানুষের শ্মশানযাত্রার এমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটবে, কে তা ভাবতে পেরেছিল। তারা কী যে করবে যখন বুঝে উঠতে পারছে না, দিশেহারার মতো এদিক সেদিকে তাকাচ্ছে, সেই সময় সমস্ত চেঁচামেচি হৈ চৈ খিস্তিটিস্তির ওপর গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন গিরধর, 'বন্ধ্ করো এ হামলাবাজি, আভি বন্ধ্ করো। শরম নেহী হ্যায় তুমহারা?' এরপর একই সুরে তিনি যা বলে গেলেন তা এইরকম। নির্লজ্জ দু কান-কাটার দল, একজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় মানুষের মৃত্যু নিয়ে যে কারণে ইতরামো শুরু করেছ তাতে কি কিছু পলিটিক্যাল ফায়দা পাওয়া যাবে? দাঙ্গাবাজি হল্লা এবং বুরা জবানের যে নমুনা তোমরা দেখালে তাতে নকীপুরের মানুষ তোমাদের হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলছে। পাঁচ মাস বাদে নির্বাচন আসছে, তাতে কেউ তোমাদের নামে ভোট পত্রতে মোহর মারবে না—এই কথাটা মনে রেখো।

মহীতোষ চৌধুরীর মতোই গিরধরও নকীপুরের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ। সৎ দেশপ্রেমী গিরধরের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে রাজনৈতিক দলের ওয়ার্কাররা চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ইট মারামারি এবং খিস্তি থেমে গেল।

এদিকে অনুপও আর্মড গার্ডদের সঙ্গে করে ভ্যান থেকে নেমে দুই বিরুদ্ধ পক্ষের লোকজনের মাঝখানে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গিরধর কণ্ঠস্বর আরো চড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'চৌধুরীজিকে কোন পলিটিক্যাল পার্টির হাতেই দেওয়া হবে না। এরা সবাই তাঁকে অসম্মান করেছে। আমরাই তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাব।' হরকিষণ শাস্ত্রীর যে লোকজনেরা আগেই লরীটা দখল করে মহীতোষকে ঘিরে বসে ছিল, তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'নেমে যাও তোমরা। আভ্‌ভী উতার যাও—'

গিরধরের ব্যক্তিত্ব এতই প্রবল যে কেউ তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে পারল না। তবে লরী থেকে কেউ নামলও না, চৌধুরীজির মৃতদেহ ঘিরে অনড় বসে রইল।

গিরধর বেশ রেগেই গেলেন, 'কী হল তোমাদের? উতারো— উতারো—'

এবার হরকিষণের কর্মীরা নড়ে চড়ে উঠল। হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে জানালো, তারা যখন উঠেই পড়েছে, গিরধরজি যেন জোর করে নামিয়ে না দেন, দয়া করে চৌধুরীজির সঙ্গে শ্মশানে যেতে দেন। তারা হৈ-হল্লা বা মারদাঙ্গা করবে না। মৃতের অমর্যাদা হয়, এমন বুরা জবান মুখে আনবে না।

এই নিয়ে আর কথা বলতে চাইলেন না গিরধর। এর মধ্যেই রাজনৈতিক দলের ছোকরারা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেড় দু-ঘণ্টা সময় নষ্ট করে দিয়েছে। সারা শহর ঘুরে শ্মশানে পৌঁছুতে নির্ঘাত বিকেল পেরিয়ে যাবে। বিরক্ত চোখে পলিটিক্যাল ওয়ার্কারগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে লরীর চালককে বললেন, 'স্টার্ট দাও—'

ভাঙা উইণ্ডস্ক্রীন নিয়ে লরী আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার, রামনেহাল দুবের ছেলেরা লরীর দখল নিয়ে নতুন করে আর কোন ঝামেলা করল না, লরীটার পেছন পেছন খুবই সংযত ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগল। মাঝে

মাঝে ভারী গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় স্লোগান দিতে লাগল।

'চৌধুরীজি—'

'জিন্দাবাদ।'

'চৌধুরীজি—'

'অমর রহে।'

বোঝা যায়, গিরধরের ধমকে এবং হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়ায় বেশ কাজ হয়েছে।

লরীটা নকীপুরের নানা জায়গায় ঘুরে মহীতোষদের বাড়ি এসে থামল। যারা ইট-পাথরের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে এসেছে। তা ছাড়া লরীটা যখন নকীপুরের নানা মহল্লায় ঘুরছিল আরো অগুনতি মানুষ শোকমিছিলে মিশে হাঁটতে শুরু করেছে। ফলে মিছিলটা সিকি মাইল লম্বা হয়ে গেছে। যে পাড়া দিয়েই লরীটা ঘুরেছে সেখানকার মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য মহীতোষের মৃতদেহে প্রচুর ফুলের স্তবক এবং মালা দিয়েছে। ফুলে ফুলে লরীটা এখন বোঝাই।

এর মধ্যে ডাক্তার পাটনা থেকে চলে এসেছিল। তাদের এবং জয়াকে লরীতে তুলে নেওয়া হল। প্রভাবতীকে শ্মশানে নেওয়া হবে না। স্বামীকে চিতায় তোলার দৃশ্য তাঁর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে। প্রভাবতীর পঙ্গু নার্ভগুলো তা সহ্য করতে পারবে না। ফলে আরেকটি অবধারিত মৃত্যু ঘটে যাবে। আগে থেকেই তাঁকে ইঞ্জেকসান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মোতিয়ার অবস্থাও সাঙ্ঘাতিক। তাকেও ইঞ্জেকসান দিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছে।

এক সময় আবার লরী চলতে শুরু করল। তারপর আরো কয়েকটা মহল্লা ঘুরে নকীপুরের উত্তর দিকের শেষ মাথায় একটা ছোট পাহাড়ী নদীর ধারে শ্মশানঘাটে যখন এসে পৌঁছুল, সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে একটা

সাদা ঝকঝকে মোটরও এসে পড়ল। রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্থানীয় ডি এম তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে মহীতোষকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁদের তরফ থেকে দু'টি ফুলের স্তবক নিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে মহীতোষের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানিয়ে দু'টি শোকবার্তা।

এর মধ্যে মহীতোষের খাট লরী থেকে নামানো হয়েছিল। ডি এম ফুলের স্তবক দু'টি খাটের এক ধারে রেখে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর শোকবার্তা দু'টি জয়ার হাতে দিয়ে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সমবেদনার কথা মৌখিকভাবেও জানালেন। সেই সঙ্গে নিজের সহানুভূতিও। প্রতিশ্রুতি দিলেন এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পাণ্ডাদের কোনভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে না, যে ভাবেই হোক তাদের ধরে এনে চরম শাস্তি দেওয়া হবে, ইত্যাদি।

রাত বেড়ে যাচ্ছিল। তাই আর দেরি করা হল না। দ্রুত মহীতোষকে স্নান করিয়ে, নতুন পোশাকে, ফুলে এবং চন্দনে সাজিয়ে পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে চিতায় তোলা হল। শাস্ত্রমতে বিবাহিতা গোত্রান্তরিতা মেয়ের চাইতে কুমারী মেয়ের অধিকার বেশি বলে জয়াই মহীতোষের মুখাগ্নি করল। চোখের জলে তখন তার বুক ভেসে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর কয়েক হাজার মানুষের কণ্ঠে 'চৌধুরীজি অমর রহে' ধ্বনির মধ্যে চিতার আগুন জ্বলে উঠল। ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে লাগল মহীতোষের নশ্বর দেহ।

শ্মশানের কাজ শেষ হতে হতে মাঝ রাত পেরিয়ে গেল।

ছয়

পরের দিন সকালে 'নকীপুর সমাচারে'র প্রথম পাতায় বিশদভাবে মহীতোষের শ্মশানযাত্রার রিপোর্ট বেরুল। সঙ্গে শোক মিছিলের অনেক ছবি। তবে যেটা সব চাইতে বেশি করে চোখে পড়ে তা হল ফুলে ফুলে ঢাকা, চিরনিদ্রায় শায়িত মহীতোষের ছবিটি।

আজও দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট মানুষেরা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে এবং মহীতোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে সব বার্তা পাঠিয়েছেন, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তা ছাপা হয়েছে।

পরশু মহীতোষ খুন হয়ে যাবার পর 'নকীপুর সমাচারে'র মালিক এবং সম্পাদক চতুরলাল জয়াকে ইন্টারভিউ করতে নিজেই ছুটে এসেছিলেন। কাল অবশ্য আর আসেন নি। কাল শ্মশানযাত্রার মতো একটা শোকাবহ ব্যাপার ছিল, তার মধ্যে এসে নিশ্চয়ই তিনি উৎপাত বাধাতে চান নি।

এদিকে আজও অফিসে যায় নি বিকাশ। যাবার উপায়ও নেই। ভোর হতে না হতেই কালকের মতো আজও নকীপুরের অজস্র মানুষ সহানুভূতি জানাতে আসছে। এদের সামলাতে ত হচ্ছেই, সবার সঙ্গে দু-একটা করে কথাও বলতে হচ্ছে। তা ছাড়া এ বাড়ির কেউ এখনও ভয়াবহ আকস্মিক আঘাতের ধাক্কাটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কাল সারাদিন এবং সারারাত কান্নার পর জয়া অবশ্য কিছুটা শান্ত হয়েছে। তবে ছায়া এবং মোতিয়ার কান্না আর থামতে চাইছে না। আর প্রভাবতীর অবস্থা বলে বোঝানো যাবে না। ইঞ্জেকসানের ঘোরটা ভোর বেলাতেই কেটে গিয়েছিল। তারপর পাড়ার মহিলারা এবং পুরোহিত সিঁদুর মুছিয়ে, শাঁখা ভেঙে, স্নান করিয়ে তাঁকে একটা নতুন সাদা থান পরিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে আচ্ছন্নের মতো তিনি বসে আছেন আর গাল বেয়ে অবিরাম জল ঝরে যাচ্ছে।

কাল সেই যে মৃণালিনী এ বাড়ি এসেছিলেন, তাঁর আর ফেরা হয় নি। সোনা আর রমানাথ মাঝে মাঝে নিজেদের বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসছেন।

গিরিধরও অত রাতে ফিরতে পারেন নি। এখানকার যা অবস্থা তাতে কবে পারবেন, বলা মুশকিল।

এখন ন'টার মতো বাজে।

প্রভাবতীর ঘরে তাঁকে ঘিরে বসে আছেন মৃণালিনী, সোনা, ছায়া ছায়ার ছেলে টিটো এবং পাড়ার কিছু মহিলা। মোতিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে কেঁদেই চলেছে।

পাশের ঘরটায় পড়াশোনা করতেন মহীতোষ। এটাকে তাঁর লাইব্রেরিই বলা যায়। চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলো পুরনো ধরনের ভারী ভারী আলমারি নানা বিষয়ের বইতে ঠাসা। ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান দর্শন নৃতত্ত্ব সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি—এমন কোন সাবজেক্ট নেই যার সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল না। বাড়িতে যে সময়টুকু থাকতেন ঘুম-স্নান-খাওয়া ইত্যাদি বাদ দিলে পড়াশোনা করেই কাটিয়ে দিতেন। পড়তেন বেশি, তবে লেখার অভ্যেস তেমন ছিল না। চিঠিপত্র বাদ দিলে রোজই অবশ্য দু-এক পাতা ডায়েরি লিখতেন।

ঘরের একধারে ড্রয়ারওলা বড় টেবল, গদী-মোড়া চেয়ার। টেবলটার ওপর ডাঁই-করা অগুনতি বই, কলম, প্যাড একটা ফোনও রয়েছে।

ঘরটার ঠিক মাঝখানে কয়েকটা ভারী সোফা, সেন্টার টেবল।

এই মুহূর্তে সোফায় বসে ছিলেন গিরধর, ছায়ার স্বামী উৎপল, রমানাথ, জয়া এবং জয়াদের পুরোহিত সুদর্শন ভট্টাচার্য। মহীতোষের পারলৌকিক কাজ অর্থাৎ শ্রাদ্ধের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

ঠিক এই সময় ফোন বেজে উঠল। বিকাশ উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল।

'হ্যালো, কে বলছেন ?'

ওধার থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'আমি 'নকীপুর সমাচার' থেকে বলছি।'

চেনা গলা। তবু নিশ্চিত হবার জন্য বিকাশ বলল, 'কে চতুর-লালজি?'

চতুরলালও বিকাশের গলা চিনতে পেরেছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ। কাল শ্মশানে অনেকক্ষণ ছিলাম।'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, আপনাকে আমি দেখেছি।

'শেষ পর্যন্ত অবশ্য থাকতে পারি নি। সব কাজ চুকিয়ে কখন বাড়ি ফিরতে পারলে?'

'রাত একটা হয়ে গিয়েছিল।'

'তা ত হবেই। তারপর বল, চৌধুরীজির স্ত্রী কেমন আছেন?'

'খুব খারাপ। স্বামীর এভাবে মৃত্যু তাঁকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে।'

গভীর সহানুভূতির গলায় চতুরলাল বললেন, 'সেটাই স্বাভাবিক। ওঁকে খুব সাবধানমতো রাখবে।'

বিকাশ বলল, 'তা ত রাখতেই হবে।'

'অন্য সবার খবর কী?'

মহীতোষের মৃত্যুজনিত শোকে বাকি সবাই কতটা কাতর এবং আচ্ছন্ন হয়ে আছে, বিকাশ জানিয়ে দিল।

চতুরলাল বললেন, 'জয়া তা হলে খানিকটা সামলে উঠেছে।'

বিকাশ বলল, 'না উঠে উপায় কী। সবাই ভেঙে পড়লে কে কাকে দেখবে?'

'আমার কথাটা মনে আছে?'

'সেই ইন্টারভিউর ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ।'

'আর ক'টা দিন যাক। এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারে নি জয়া।'

চতুরলাল বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'গ্যাখো বিকাশ, ইন্টারভিউটা আর দেরি করা ঠিক হবে না। টাটকা টাটকা না হলে পরে ওটার আর ইমপ্যাক্ট হবে না।'

বিকাশ এত তাড়াহুড়ো করতে রাজী নয়। আসলে এই মুহূর্তে জয়ার যা মানসিক অবস্থা তাতে একজন ঝানু জার্নালিস্টের উল্টোপাল্টা জেরার মুখে পড়লে কী বলতে কী বলে বসবে, ঠিক নেই। তাতে মহীতোষের খুনের ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যাবে। হত্যাকারীরা এমন সতর্ক হয় যাবে যে পুলিশের পক্ষে তাদের ধরতে ভয়ানক বেগ পেতে হবে। হয়ত তারা ধরাই পড়বে না। বিকাশের অনিচ্ছা থাকলে কী হয়, চতুরলাল কিছুতেই ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, দু দিন পর জয়ার মন আরেকটু শান্ত হলে ইন্টারভিউ দেবে।

. চতুরলালের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে জয়াদের কাছে এসে বিকাশ সবে বসেছে, আবার ফোন বেজে উঠল। ফের উঠে এসে টেলিফোনটা তুলে কানে লাগাতেই অনুপের গলা শোনা গেল। জয়াদের খোঁজখবর নেবার পর সে বলল, 'আমি এখনই আপনাদের ওখানে আসছি। পুলিশের কাজ ত, অপ্রিয় ব্যাপারটা আর ফেলে রাখা যাবে না। সবাই যেন বাড়িতে থাকেন। আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকের সঙ্গে আমি কথা বলব।'

যত সহজে খবরের কাগজের লোককে অনিচ্ছার কথা জানানো গিয়েছিল, পুলিশ অফিসারকে তত সহজে বলা গেল না। একটু দ্বিধান্বিতভাবে বিকাশ বলল, 'শ্মশান থেকে কাল মাঝরাতে সবাই ফিরেছে। বাকি রাত কেউ ঘুমোতে পারে নি। বুঝতেই পারছেন মেণ্টাল শকটা কী রকম চলেছে। এ সময়—' বলতে বলতে থেমে গেল।

বিকাশের দ্বিধার কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না অনুপের। সে বলল, 'সবই বুঝতে পারছি কিন্তু আনপ্লেজাণ্ট কাজটা না করলেই নয়। যত দেরি হবে ক্লু-গুলো হাতের বাইরে বেরিয়ে যাবে।'

'তা হলে আসুন।'

ঠিক পনের মিনিট বাদে একটা জীপে করে অনুপ চলে এল। তার সঙ্গে একজন সাব ইন্সপেক্টরও এসেছে। বিকাশ তাদের নিয়ে মহীতোষের নিজস্ব পড়ার ঘরে বসল।

অনুপ বলল, 'প্রথমে আমি মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বিকাশ বলল, 'তিনি এখানে উঠে আসতে পারবেন না। জানেনই ত সব—'

ব্যস্তভাবে অনুপ বলল, 'কি আশ্চর্য, উনি আসবেন কেন ? আমিই যাব। কথাবার্তার সময় অন্য কেউ যেন না থাকে। মিসেস চৌধুরীর ঘরটা ফাঁকা করে দেবেন।' বলে একটু ভাবল, 'অবশ্য—'

'কী ?'

'আপনি আর মিস চৌধুরী কাছে থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ পর বিকাশ আর জয়া অনুপ এবং সাব ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে করে প্রভাবতীর ঘরে চলে এল।

প্রভাবতী ছাড়া এ ঘরে এখন আর কেউ নেই। খাটের পাশে অনুপদের বসবার জন্য দু-তিনটে চেয়ার এনে আগেই রেখে দিয়েছিল বিকাশ। সে বলল, 'বসুন—'

অনুপ এবং সাব ইন্সপেক্টর দুটো চেয়ারে বসল। বিকাশরা দাঁড়িয়ে রইল।

মুখটা অনুপদের দিকে ফিরিয়ে প্রভাবতী বিষণ্ণ নির্জীব চোখে তাকালেন। কিছু বললেন না।

অনুপ খুব আস্তে আস্তে নরম গলায় বলল, 'ক্ষমা করবেন, এ সময় আপনাকে বিরক্ত করা উচিত নয়, কিন্তু বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে।' একটু থেমে গলা খাকরে আবার শুরু করল, 'চৌধুরীজির মতো এমন একজন বিরাট মানুষকে এভাবে খুন করা হল। এটা দেশের পক্ষে যে কত বড় ক্ষতি, বলে বোঝানো যায় না।'

প্রভাবতী তাকিয়েই রইলেন। অনুপের কথাগুলো তিনি যেন শুনতেই পাচ্ছেন না।

অনুপ থামে নি। সে আবার বলল, 'এরকম একটা জঘন্য কাজের পর যদি খুনীরা রেহাই পেয়ে যায়, সেটা আমাদের পক্ষে ভীষণ লজ্জার। মার্ডারারদের আমরা কিছুতেই ছাড়ব না। কিন্তু তাদের ধরতে হলে আপনাদের সাহায্য একান্তভাবে দরকার।'

আবছা গলায় প্রভাবতী এবার বললেন, 'যে চলে গেছে সে ত আর ফিরবে না। সবই শেষ হয়ে গেছে। কা হবে আর এই নিয়ে—' কথার মাঝখানেই হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন।

অনুপ অনেকখানি ঝুঁকে এবার বোঝাতে লাগল। দোষীদের শাস্তি না দিলে তাদের বুকের পাটা বেড়ে যাবে। যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়াবে তারা। এটা হতে দেওয়া যায় না।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রভাবতী। তারপর বললেন, 'বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি।'

অনুপ সাব ইন্সপেক্টরকে বলল, 'শর্মা, নোট বই আর পেন বার করে মিসেস চৌধুরীর স্টেটমেন্ট টুকে নাও।' বোঝা গেল এই জন্যেই শর্মাকে সঙ্গে করে এনেছে সে। প্রভাবতীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কত দিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে?'

একটু চিন্তা করে প্রভাবতী বললেন, 'বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর।'

'একসঙ্গে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছেন। নিশ্চয়ই চৌধুরীজির জীবনের সব কিছু খুঁটিনাটি আপনি জানেন। বলতে পারেন, তাঁর কোন বড় শত্রু আছে কিনা।'

'শত্রুতা হতে পারে, এমন কাজ উনি কখনো করেন নি। মানুষকে চিরকাল ভালই বেসে এসেছেন, সবার বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, সুখে দুঃখে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য—'

'অবশ্য কী?'

'যখন পরাধীন ছিলাম, ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেছেন।

ইংরেজরা এ জন্যে ওঁকে শত্রুই মনে করত। জীবনের ষোল সতেরটা বছর ওরা তাঁকে জেলে আটকে রেখেছে।'

অনুপ বলল, 'সে সব ত স্বাধীনতার আগের ব্যাপার। ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন ইচ্ছা করলে কবেই ওঁকে খুন করে ফেলতে পারত। ইংরেজরা ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর আগে এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এত দিন বাদে ওরা লোক লাগিয়ে একজন দেশনেতাকে মার্ডার করাবে, এটা ভাবা যায় না। আমি স্বাধীনতার পরের কথা বলছি। এখন পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর মধ্যে মারাত্মক গোলমাল আর শত্রুতা। একদল আরেক দলের দিকে বন্দুক উঁচিয়েই রেখেছে।'

বিষণ্ণ হাসেন প্রভাবতী। বলেন, 'স্বাধীনতার পর উনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কত বার ওঁকে নির্বাচনে নামার জন্যে চাপ এসেছে, দিল্লীতে গিয়ে বড় দায়িত্ব নেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে, উনি রাজী হন নি। রাজনৈতিক কারণে কেউ ওঁর শত্রুতা করবে, এ আমি ভাবতে পারি না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অনুপ এবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলতে পারেন চৌধুরীজি রিসেন্টলি এমন কিছু কাজ করেছেন বা বলেছেন যাতে অন্যের স্বার্থে ঘা পড়তে পারে।'

'আমার জানা নেই।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল প্রভাবতীর, 'ও হ্যাঁ, শুনেছিলাম, কী একটা খুনের মামলায় উনি সাক্ষী দেবেন বলে ঠিক করেছেন। যাতে উনি সাক্ষী না দেন, সে জন্যে কারা যেন টেলিফোনে ওঁকে শাসাচ্ছিল।'

'কারা?' গলার স্বর বেশ তীক্ষ্ণ শোনালো অনুপের। তাকে বেশ উত্তেজিতই দেখাচ্ছে।

প্রভাবতী উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ জয়া বলে উঠল, 'কারা নয়, একজনই ফোনে—'

হাত তুলে জয়াকে থামিয়ে দিল অনুপ। বলল, 'আপনার সঙ্গে পরে এ নিয়ে কথা বলব। আমি ওঁর কাছ থেকেই এখন শুনতে চাই।'

প্রভাবতীকে বলল, 'কারা ফোন করছিল—বলুন।'

প্রভাবতী বললেন, 'নাম বলতে পারব না। আমি জয়ার বাবাকে অনেক বার জিজ্ঞেস করেছি। উনি বলেছেন, ওটা এমন কিছু ব্যাপার না। আসলে ক'বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছি। কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করি, এটা উনি চাইতেন না। ফোনে যদি কেউ শাসিয়েও থাকে, আমাকে বলেন নি।'

'না বললেও, কে শাসাতে পারে, আপনি আন্দাজ করতে পারেন?'

'না। নকীপুরের লোক চিরকালই ওঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে এসেছে। কেউ অপমান করতে পারে বা হুমকি দিতে পারে, এ আমি ভাবতেই পারি না।'

অনুপ বলল, 'অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। আজ এই পর্যন্ত থাক। আপনি বিশ্রাম করুন।'

আস্তে মাথা নাড়লেন প্রভাবতী, কিছু বললেন না।

অনুপ উঠতে উঠতে বলল, 'পরে দরকার হলে আবার হয়ত আসতে হবে।'

প্রভাবতী বললেন, 'আসবেন।'

সাব ইন্সপেক্টর শর্মাও নোট বই বন্ধ করে উঠে পড়েছিল। অনুপ বিকাশকে বলল, 'আমরা চৌধুরীজির পড়বার ঘরে গিয়ে বসছি। বাড়ির সবাইকে এক এক করে ওখানে আসতে বলুন।'

এ বাড়িতে লোকজন বলতে ছিল মোট চারজন। মহীতোষ প্রভাবতী মোতিয়া এবং জয়া। ছায়ার বিয়ে হয়ে গেলেও তাকে এবং তার স্বামীকে ধরা যেতে পারে। বলা যায় না, তাদের কাছ থেকে কোন জরুরী ক্লু পাওয়া যেতেও পারে। এরা ছাড়া বিকাশ এবং গিরধরের সঙ্গেও কথা বলতে চাইল অনুপ।

মহীতোষের পড়ার ঘরটা ফাঁকা করে অনুপ এবং শর্মাকে বসানো হল। জয়াও এখানেই বড় টেবলের পাশের চেয়ারটায় বসল। আর

একজন একজন করে সবাইকে ডেকে আনতে লাগল বিকাশ।

কিন্তু মোতিয়া, ছায়া, ছায়ার স্বামী উৎপল বা গিরধরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও এমন কিছু বার করা গেল না যা থেকে মহীতোষের খুনীদের সম্পর্কে এতটুকু আঁচ পাওয়া যায়। হত্যারহস্য যেখানে ছিল সেখানেই অনড় দাঁড়িয়ে রইল।

মোতিয়াদের পর এল বিকাশের পালা।

অনুপ বলল, 'আপনি ত চৌধুরীজিদের খুবই ইন্টিমেট। এক মহল্লাতেই থাকেন, ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়িতে আসছেন। শুনেছি, চৌধুরীজিদের সঙ্গে আপনার একটা ভেরি সুইট রিলেশান হতে যাচ্ছে।'

অনুপের ইঙ্গিতটা খুবই পরিষ্কার, বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। অল্প দূরে জয়ার মুখে রক্তাভা ফুটল, মুখ নামিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল।

লাজুক হাসল বিকাশ, তবে কিছু বলল না। এর পর অনুপ কী বলবে, সে জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অনুপ বলল, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। আপনি এ বাড়ি, বিশেষ করে চৌধুরীজি সম্পর্কে সবই জানেন।'

'সব জানি কিনা বলতে পারব না। তবে অনেকের চাইতে বেশিই জানি।'

'এই মার্ডার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তবে উনি আমাকে অচেনা লোকটার ফোনের কথা বলেছিলেন।'

'কবে বলেছিলেন?'

'পনের দিন আগে প্রথম বলেন। তারপর দু-তিন বার বলেছেন।'

'যা যা বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?'

'আছে।'

'ভাল করে ভেবে সব বলুন।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বিকাশ বলল, 'লোকটা প্রথম প্রথম মহীতোষ

কাকাকে অনুরোধ করেছে, তিনি যেন ভানুপ্রতাপের মার্ডার কেসে সাক্ষি দিতে না যান। যখন সাক্ষি দেবার ব্যাপারে কোনভাবেই তাঁকে আটকাতে পারে নি তখন লোকটা শাসিয়েছিল, এর ফল ভাল হবে না।'

'ফল ভাল হবে না বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিল লোকটা? মার্ডার?'

'আমিও সে কথা মহীতোষ কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।' বিকাশ বলল, 'খুব গম্ভীর আর চাপা ধরনের মানুষ ও। মার্ডারের কথা বলেন নি।'

অনুপ জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি ভয়টয় পেয়েছিলেন?'

'একেবারেই না। আসলে এই ফোনের ব্যাপারটাকে উনি কোন-রকম ইমপর্টান্স ছান নি।'

'কেন?'

'আত্মবিশ্বাস ওঁর প্রচণ্ড। ফোনের হুমকিটাকে উনি গ্রাহ্যই করেন নি। নকীপুরের মানুষ তাঁর অসম্মান বা ক্ষতি করবে, এ তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না।'

'যে লোকটা ফোন করত তার সম্পর্কে আপনার কোন আইডিয়া আছে?'

'না। তবে—'

'তবে কী?'

'আমার ধারণা, ভানুপ্রতাপ সহায়কে যারা খুন করেছে বা করিয়েছে, এ মার্ডারটা তাদেরই কাজ।'

'ঠিকই ধরেছেন। আমিও গোড়া থেকে তা-ই ভেবে আসছি। দুটো মার্ডারই একসঙ্গে জড়ানো। ভানুপ্রতাপের মার্ডারারদের ধরতে পারলে চৌধুরীজির খুনীদেরও ধরা যাবে।'

বিকাশ মাথা নাড়ল। বলল, 'আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?' উৎসুক মুখে তাকাল অনুপ।

'ভানুপ্রতাপ সহায় আর মহীতোষ কাকাকে একই লোক খুন করেছে বা করিয়েছে। ওদের ধরতে পারলে দুটো মার্ডার রহস্যেরই

কিনারা হয়ে যাবে।'

'রাইট রাইট। আমাকে সেই ভাবেই এগুতে হবে।'

বিকাশের পর জয়াকে প্রশ্ন করতে শুরু করল অনুপ। অন্য সকলকে সে যা যা জিজ্ঞেস করেছিল, জয়াকেও তা-ই করল। অর্থাৎ মহীতোষের কোন শত্রু আছে কিনা, তিনি এমন কিছু করেছেন কিনা যাতে অন্যের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত ফোনের অচেনা লোকটির প্রথমে অনুরোধ, পরে শাসানির ব্যাপারটা অনিবার্যভাবেই এসে গেল।

অনুপ জিজ্ঞেস করল, 'ফোনে যে লোকটা হুমকি দিত তার সম্বন্ধে চৌধুরীজি কি আপনাকে কিছু বলেছেন?'

জয়া বলল, 'বলেছেন।'

'উনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন?'

'না। তবে—'

'কী?' উৎসুক চোখে তাকাল অনুপ।

জয়া বলল, 'বাবা বলেছিলেন, লোকটার কথা বলার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যাপার আছে।'

জয়ার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে অনুপ বলল, 'কি রকম?'

'প্রায় প্রতি সেনটেন্সেই নিজের সম্বন্ধে একবার 'ছোটা-মোটা আদমী' বলেছে লোকটা।'

অনুপের দু চোখ উত্তেজনায় চকচক করতে লাগল। সে বলল, 'এটা একটা দুর্দান্ত ক্লু। চৌধুরীজি লোকটার আর কোন স্পেশালিটির কথা বলেছেন? যেমন ধরুন, গলার স্বর, কথা বলার বিশেষ ভঙ্গি—এই সব।'

জয়া বলল, 'একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

অনুপ বলল, 'এই যেমন, কেউ হুড়বড় করে ঝড়ের বেগে কথা বলে, কেউ বলে আস্তে আস্তে। কারো গলা শুনলে মনে হয় চিৎকার করছে। কারো স্বর মোটা, কারো এত সরু যে কানের পর্দায় ছুঁচের মতো বিঁধে

যায়। এ সব জানতে পারলে হাজার হাজার মানুষের ভেতর থেকে একটা পার্টিকুলার লোককে খুঁজে বার করতে সুবিধা হয়।'

একটু ভেবে জয়া বলল, 'না. বাবা ওই 'ছোটা-মোটা আদমী' ছাড়া আর কিছু বলেন নি।'

'ভাল করে চিন্তা করুন।'

অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল জয়া। খুব সম্ভব লোকটা সম্পর্কে মহীতোষ যা যা বলেছেন, মনে করতে চেষ্টা করছে। একসময় চোখ মেলে বলল, 'না, আর কিছু মনে পড়ছে না।'

'ঠিক আছে, পরে যদি মনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

'লোকটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেছে ?'

'হিন্দী। বাবা বলেছেন, মাঝে মাঝে হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজি আর বাংলাও মিশিয়ে দিয়েছে।'

'কোন এরীয়ার হিন্দী—ভোজপুরের, পূর্ণিয়ার, না মোতিহারির, না অন্য কোন জায়গার ?'

'এত ডিটেলে বাবার সঙ্গে কথা হয় নি। কোথাকার হিন্দী বলতে পারব না।'

একটু চুপ। তারপর অনুপ বলল, 'এবার মোটর সাইকেলে করে যে মার্ডারার দুটো এসেছিল, তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করব।'

জয়া উত্তর না দিয়ে অনুপের মুখের দিকে তাকাল।

অনুপ বলল, 'মার্ডারাররা যে গাড়িতে এসেছিল আমরা তার নাম্বারটা জানতে পেরেছি। তবু ভেরিফাই করতে চাই। আপনি কি নাম্বারটা লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন ?'

'না। এত স্পীডে মোটর সাইকেলটা কাছাকাছি এসে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উধাও হয়ে গিয়েছিল যে কোনদিকে তাকাবার সময় পাই নি।' জয়া বলতে লাগল, 'বাবার গায়ে তখন গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। সেই সময় আমার মাথার ঠিক ছিল না। মোটর

সাইকেলের নাম্বার ত দূরের কথা, কোন কিছু খুঁটিয়ে দেখার কথা তখন মনেই হয় নি।'

'ঠিক।' অনুপ বলল, 'মার্ডারার দুটো নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছিল।'

'হ্যাঁ।'

'তাদের বয়েস কিরকম হবে?'

'পঁচিশ-ছাব্বিশ। দু-এক বছর এদিক সেদিক হতেও পারে।'

'ওদের চেহারার ডেসক্রিপসান দিতে পারেন?'

'মোটর সাইকেলটার স্পীড এত বেশি ছিল যে ভাল করে দেখার সময় পাই নি। তা ছাড়া গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে যখন বেরিয়ে গেল তখন বাবার দিকে ছাড়া আর কোন দিকে আমার নজর ছিল না।'

'তবু একটু ভাবতে চেষ্টা করুন।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে জয়া বলল, 'কারেক্ট ডেসক্রিপসান দিতে পারব না।'

অনুপ বলল, 'যতটুকু পারেন তা-ই দিন।'

জয়া এবার থেমে থেমে বলতে লাগল, 'ওদের মুখ ভাল করে দেখতে পাই নি। কেননা দু' জনেরই মাথায় ছিল হেলমেট। চামড়ার চওড়া পটি দিয়ে গালের অনেকটা ঢেকে, থুতনির তলায় সেটা বাঁধা। চোখে ছিল হাল্কা ব্রাউন রঙের গগলস্। দু'জনেরই গগলস্ চোখের ওপর সেঁটে বসানো ছিল, হাতে ছিল গ্লাভস। যতদূর মনে পড়ছে ওদের পরনে ছিল টাইট জীনস আর লম্বা কলারওলা জ্যাকেট।'

'আর কিছু?'

'হেলমেট পরা থাকলেও যে গাড়ি চালাচ্ছিল তার মুখটা যতদূর মনে পড়ছে, লম্বা ধাঁচের, পেছনে যে বসে ছিল তার মুখ গোল। দু'জনেই বেশ লম্বা। ছ' ফুটের মতো হাইট হবে।'

'গুড। বলে যান—'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে নিল জয়া। তারপর বলল, 'যে গাড়িটা

ড্রাইভ করছিল সে কিন্তু গুলি করে নি। যে পেছনে বসে ছিল সে-ই আমাদের অটো-রিকশার পাশ দিয়ে যেতে যেতে গুলি চালিয়েছে।'

অনুপ বলল, 'চলন্ত গাড়ি থেকে টার্গেটে হিট করা ভীষণ ডিফিকাল্ট। হী ইজ ডেফিনিটলি এ ক্র্যাক শট। মনে হয় প্রফেসানাল মার্ডারার।'

কথাগুলো যেন শুনতে পায় নি জয়া। অন্যমনস্কর মতো বলল, 'দু চার সেকেণ্ডের জন্যে হলেও একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়েছে।'

'কী বলুন ত?'

'লোকটা, যত দূর মনে হচ্ছে, বাঁ হাতে বন্দুক চালিয়েছিল।'

'লেফট হ্যাণ্ডেড?' অনুপ শিরদাঁড়া টান টান করে বসল। শরীরের সমস্ত পেশি আচমকা যেন শক্ত হয়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'ঠিক দেখেছেন ত?'

মনের ভেতর কোথায় যেন সংশয়ের একটু ভাব ছিল জয়ার, মুহূর্তে সেটা কেটে গেল। স্পষ্ট করে, গলায় বেশ জোর দিয়েই সে বলল, 'হ্যাঁ। লোকটা ন্যাটা—লেফট হ্যাণ্ডেডই।'

অনুপের গলার ভেতর থেকে চাপা শিসের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল যেন। সে বলল, 'দিস ইজ এ ভেরি ভেরি ইমপর্টাণ্ট ক্লু। আপনারা এখানে যাঁরা আছেন এই বাঁ-হাতি লোকটার কথা কারো কাছে বলবেন না। এটা সিক্রেট রাখা খুবই জরুরী।'

বিকাশ এবং জয়া মাথা নেড়ে জানালো—বলবে না। শর্মা পুলিশের লোক—অনুপের সহকারী, তার বলার প্রশ্নই ওঠে না।

অনুপ আবার বলল, 'আর কিছু মনে পড়ছে?'

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল জয়া।

অনুপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে থেকে মাইকের আওয়াজ ভেসে এল। মনে হল, লাউডস্পীকারে কারা যেন কিছু বলতে বলতে আর স্লোগান দিতে দিতে সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সব কথা বোঝা না গেলেও মাঝে মাঝে মহীতোষের নামটা শোনা যাচ্ছে।

বিকাশ বলল, 'কী ব্যাপার? কারা এরা?' বলেই বাইরে চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে গেল। তার পিছু পিছু অন্য সবাই চলে এল। পাশের ঘর থেকে ছায়ারাও বেরিয়ে এসেছে।

একটা জীপে করে ক'টা অল্প বয়সের ছেলে উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে। ড্রাইভার ছাড়া বাকি সবাই গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে মাইক। জীপটার সামনে রামনেহালদের পার্টির ফ্ল্যাগ দড়ি দিয়ে বাঁধা।

যার হাতে মাইক সে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল, 'পরশু রোজ সোমবার মহান জননেতা মহীতোষ চৌধুরীজিকা হত্যাকা প্রতিবাদ করনেকে লিয়ে সুবেসে সামতক হড়তাল হোগা। হরতাল সফল কীজিয়ে।'

হরতালের ডাক দিতে দিতে মাঝে মাঝে ছোকরা গম্ভীর গলায় বলে উঠছিল, 'মহীতোষ চৌধুরীজি—'

অন্য সঙ্গীরা গলা মিলিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'অমর রহে, অমর রহে—'

জীপটা জয়াদের বাড়ির সামনে দিয়ে একসময় খাড়া দক্ষিণে খানিকটা এগিয়ে, একটা মোড় ঘুরে গাছপালা এবং বাড়িঘরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনুপের চোখেমুখে সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটে উঠতে উঠতেই মিলিয়ে গেল। চাপা গলায় সে বলল, 'খেলাটা দারুণ জমে উঠবে, মনে হচ্ছে।'

বিকাশ পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'কিসের খেলা?'

'পলিটিক্সের।'

'কিরকম?'

'রামনেহাল দুবের পার্টি ত চৌধুরীজির ডেড বডির দখল নিতে পারে নি। তাই হরতাল ডেকেছে।' বলতে বলতে গলার স্বর ঝপ করে আরো অনেকটা নামিয়ে দেয় অনুপ। 'চৌধুরীজির মৃত্যু নিয়ে টাগ অফ ওয়ার ভালই চলছে। ইলেকসান আসছে কিনা।'

এ জাতীয় মন্তব্য গিরধর আগেই করেছেন। বিকাশ উত্তর দিল না।

অনুপ এবার বলল, 'আমরা এখন যাই। পরে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

অনুপ যখন শর্মাকে সঙ্গে করে একতলার সিঁড়ির কাছে চলে গেছে সেই সময় জয়া বেশ ব্যস্তভাবেই ডেকে উঠল, 'শুনুন, শুনুন—' হঠাৎ কিছু একটা তার মনে পড়ে গেছে।

অনুপরা ফিরে এল। জয়া বলল, 'ভেতরে আসুন, একটা ব্যাপার একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

মহীতোষের পড়ার ঘরে এসে জয়া বলল, 'বাবার ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। অবশ্য সারা জীবন যে লিখেছেন তা নয়। লাস্ট দশ বারো বছর রেগুলারলি লিখে আসছিলেন। আমার মনে হয় এগুলো আপনার কাজে লাগতে পারে। দেখবেন?'

'অবশ্যই।' অনুপকে রীতিমত উত্তেজিতই দেখাল। সে বলতে লাগল, 'শুনেছি চৌধুরীজি ছিলেন ভীষণ ইনট্রোভার্ট। যে সব কথা মুখে বলতে চাইতেন না, খুব সম্ভব তা ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন। আমার বিশ্বাস, ডায়েরিগুলোতে ইমপর্টান্ট কিছু ক্লু পাওয়া যাবে।'

বড় টেবলের ড্রয়ার থেকে বারো বছরের মোট বারোখানা ডায়েরি বার করে অনুপের হাতে দিতে দিতে জয়া বলল, 'আপনাদের কাজ হয়ে গেলে ফেরত দেবেন। বাবার স্মৃতি ত।'

'নিশ্চয়ই।'

সাত

মহীতোষ চৌধুরী খুন হবার পর কয়েক দিন কেটে গেছে। নকীপুরে এই হত্যাজনিত উত্তেজনা অনেকটাই থিতিয়ে এসেছে। সেটাই স্বাভাবিক। উত্তেজনার আয়ু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তবে এই হত্যার কথা সাধারণ মানুষ যাতে ভুলে না যায় সে জন্য রাজনৈতিক দলগুলো দিনরাত হৈচৈ করে যাচ্ছে।

এর মধ্যে রামনেহাল দুবেদের পার্টির ডাকে নকীপুরে বারো ঘণ্টার সম্পূর্ণ সফল হরতাল পালিত হয়েছে। দোকানপাট অফিস বাজার কিছুই খোলে নি। রাস্তাঘাটে মোটর টোটর ত দূরের কথা, একটা সাইকেল রিকশাও বেরোয় নি। বড় দলগুলোর মতো ছোট ছোট পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর বন্ধ্‌ বা হরতাল ডাকার কিংবা মিছিল বার করার ক্ষমতা নেই। তারা অনবরত এখানে সেখানে শোকসভা করে অবিলম্বে খুনীদের চরম শাস্তি দাবি করেছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেসন এবং পুলিশের তীব্র সমালোচনা করেছে। এখানেও সেই একই মোটিভ। সামনের দিকে মহীতোষের শোচনায় মৃত্যুর জন্য রাগ দুঃখ ক্ষোভ ইত্যাদি থাকলেও পেছনে রয়েছে একটি গভীর গোপন কূট উদ্দেশ্য। সবাই যেন বোঝাতে চাইছে, মহীতোষ চৌধুরী একান্তভাবে তাদেরই দলীয় সম্পত্তি। সবারই মাথার ভেতর রয়েছে আগামী নির্বাচন। বিশেষ একটা ইস্যু বা ঘটনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তারা মানুষের চোখে পড়তে চাইছে। পার্টিগুলো পরবর্তী ইলেকসান পর্যন্ত মহীতোষের খুনের ব্যাপারটা যে টেনে নিয়ে যাবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

এর মধ্যে মহীতোষের শ্রাদ্ধও চুকে গেছে। ছায়াদের পক্ষে নকীপুরে আর বেশিদিন থাকা সম্ভব ছিল না। প্রথমত, উৎপলের ছুটি পাওনা নেই। দ্বিতীয়ত, কয়েক দিনের মধ্যেই ছেলের পরীক্ষা। শ্রাদ্ধের পরদিনই ওরা পাটনায় ফিরে গেছে। বলে গেছে, টিটোর পরীক্ষা-টরীক্ষা

হয়ে গেলে আবার নকীপুরে আসবে। গিরধরও শ্রাদ্ধ পর্যন্তই এখানে ছিলেন, তার পরের দিন কুষ্ঠরোগীদের কলোনিতে চলে গেছেন।

মহীতোষের পারলৌকিক কাজ মিটবার পর হঠাৎ জয়ার খেয়াল হল 'নকীপুর সমাচার'-এর মালিক এবং সম্পাদক চতুরলাল দ্বিবেদী তার ইন্টারভিউ নিতে আসেন নি। অথচ মহীতোষ খুন হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে এই ইন্টারভিউর জন্য ছুটে এসেছিলেন, তারপর ক'দিন অনবরত ফোনে তাগাদা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কবে থেকে যে ফোন করাটা বন্ধ করেছেন, মনেও পড়ে না জয়ার। আসলে মহীতোষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা, নানা পলিটিক্যাল পার্টির শোকসভা, মা দিদি এবং মোতিয়ার দিনরাত কান্নাকাটি, অবিরাম লোকজনের যাতায়াত—এ সব নিয়ে তাকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে 'নকীপুর সমাচার'-এর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

জয়ার মনে পড়ল, শুধু চতুরলাল দ্বিবেদীই না, নকীপুরের অন্য সব ছোটখাটো পত্র-পত্রিকার করেসপনডেন্টরাও তার কাছে ইন্টারভিউর জন্য আর আসে নি। অবশ্য মহীতোষের শ্রাদ্ধের দিন চতুরলাল এবং নিউজ ম্যাগাজিনের লোকেরা এসেছিল। তখন কারো সঙ্গেই কথা বলার সময় ছিল না, কেননা পুরোহিতের মুখোমুখি বসে জয়া তখন শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ছে।

যারা তার ইন্টারভিউর জন্য প্রায় ক্ষেপেই উঠেছিল, কত বার যে ফোন করেছে তার ঠিক নেই, এমন কি বাড়ি পর্যন্ত ছুটেও এসেছে, হঠাৎ তারা এত চুপচাপ হয়ে গেল কেন? মহীতোষের মৃত্যুশোক প্রথম দিকে জয়াকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে এ নিয়ে তখন কিছু ভাবে নি, ভাবার মতো মানসিক অবস্থাও ছিল না। শ্রাদ্ধশান্তির পর শোকটা থিতিয়ে এলে চতুরলালদের কথা যত ভেবেছে ততই অবাক হয়েছে সে।

বিকাশের কাছে কিন্তু এটা এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। সে এটাকে মোটামুটি হাল্কাভাবেই নিয়েছে। বলেছে, 'টাটকা টাটকা

না পেলে নিউজপেপারের কাছে কোন খবরেরই ইমপর্টান্স থাকে না। মহীতোষ কাকার খুন হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছ থেকে ত ইন্টার-ভিউটা পেল না। এতদিন পর এটাকে আর ততটা জরুরী মনে করছে না। রীডারের ইন্টারেস্টের কথা ত ভাবতে হবে।'

জয়া কিন্তু বিকাশের কথা মেনে নিতে পারে নি। সে বলেছে, 'রীডারের ইন্টারেস্ট নেই কে বলেছে? এখন পর্যন্ত একটা খুনীও ধরা পড়ে নি। কারা মার্ডারার, লোক জানতে চাইবে না? যারা খুনের স্পটে ছিল, সাত আট গজ দূর থেকে খুনীকে নিজের চোখে গুলি করতে দেখেছে সেই সব আই-উইটনেসদের কথা শোনার কৌতূহল নিশ্চয়ই আছে রীডারের। কারণ—'

বিকাশ এত সব ভেবে দ্যাখে নি। উৎসুকভাবে সে জয়ার কথা-গুলো শুনে গেছে। জিজ্ঞেস করেছে, 'কারণটা কী?'

'প্রত্যক্ষদর্শীরাই খুনীদের সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে পারে।' জয়া বলেছে।

'আরে তাই ত। তা হলে চতুরলালজীরা এলেন না কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কিছু বলে নি। তবে চতুরলাল এবং অন্যান্য কাগজের পলিটিক্যাল করেসপনডেন্টদের সম্পর্কে তার মনে একটা খটকা থেকেই গেছে।

কাগজের লোকেরা না এলেও পলিটিক্যাল পার্টির লোকজনেরা প্রায় রোজই হানা দিয়ে যাচ্ছে। মহীতোষ চৌধুরীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিদিনই একটা না একটা মীটিং ডেকে নকীপুর শহর সরগরম করে রাখছে। এই সব শোকসভা বা জনসভায় ওরা জয়া এবং প্রভাবতীকে নিয়ে যাবার জন্য খুবই টানাটানি করে। বলা যায় প্রায় হাতে-পায়েই ধরে। কিন্তু গিরধর ওদের বার বার বলে গেছেন, কোন রাজনৈতিক দলের পাল্লায় যেন তারা না পড়ে, কেননা স্বাধীনতার পরের রাজনীতি সম্পর্কে মহীতোষের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সঙ্গে তিনি আদৌ কোন যোগাযোগ রাখতেন না।

ওরা যে রাস্তায় চলত, মহীতোষ তার দশ মাইল তফাত দিয়ে হাঁটতেন। এখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পার্টিগুলো যে তাঁর মেয়ে এবং স্ত্রীকে টানাটানি করতে চাইছে সে সম্পর্কে জয়াদের খুব সতর্ক থাকা দরকার। ফলে ওরা যতই হাতজোড় করুক, কাকুতিমিনতি করুক, জয়াদের এ জাতীয় কোন মীটিংয়েই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

মহীতোষের শ্রাদ্ধের পরও বিভিন্ন পার্টির লোকজন ছাড়া আর যারা সহানুভূতি জানাতে আসছে তারা হল এ পাড়ারই প্রতিবেশী, নকীপুরের অন্যান্য মহল্লার মানুষজন এবং জয়ার কলেজের সহকর্মীরা। তবে নিয়মিত রোজ যে আসছে সে অনুপ। আর এসেই জয়া প্রভাবতী এবং এই মহল্লার লোকদের যাকে যখন এ বাড়িতে পাওয়া যায়, নানা দিক থেকে বার বার তাদের প্রশ্ন করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, যদি হঠাৎ কারো এমন কথা কিছু মনে পড়ে যায় যা থেকে মহীতোষের হত্যারহস্যের কোন মূল্যবান সূত্র বেরিয়ে পড়ে।

আজ সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে সোজা জয়াদের বাড়ি চলে এসেছিল বিকাশ। মহীতোষের শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত সে ছুটি নিয়েছিল। তারপর থেকে আবার অফিসে যাচ্ছে।

জয়াদের বাড়িতে আর কোন পুরুষ নেই। তাই সকালের দিকে একবার এবং অফিস ছুটির পর আরেক বার জয়াদের বাড়ি এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যায় বিকাশ। কখন কী দরকার হয়! অবশ্য সকালের দিকটা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না সে। তখন অফিসের তাড়া থাকে। তবে ছুটির পর অনেকটা সময় এখানে কাটিয়ে যায়।

মহীতোষের খুনের পর জয়া আর কলেজে যায় নি। মাস দুয়েক ছুটি চেয়ে একটা লিভ অ্যাপ্লিকেসন পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার একজন কলীগ, ইংরেজির উষা মিশ্র, খবর দিয়ে গেছে প্রিন্সিপ্যাল ছুটিটা গ্র্যান্ট করেছেন। আজকাল সারাদিনই বাড়িতে থেকে জয়া সব দিক সামলায়।

যাই হোক, রোজই সন্ধ্যেবেলা এসে প্রভাবতীর কাছে বেশির ভাগ

সময়টা কাটিয়ে দেয় বিকাশ। তাঁকে সঙ্গ দেওয়া খুবই জরুরী; নানারকম কথা বলে, গল্প করে যতক্ষণ এই পঙ্গু শোকাচ্ছন্ন মানুষটাকে অন্যমনস্ক রাখা যায়। অবশ্য বেশিক্ষণ প্রভাবতী কাউকেই তাঁর কাছে বসতে দিতে চান না। বলেন, 'এতক্ষণ অসুস্থ মানুষের পাশে বসে থাকলে তোমরাও অসুস্থ হয়ে পড়বে।' একরকম জোর করেই, যে তাঁর কাছে আসে, তাকে তুলে দেন। আসলে মহীতোষের মৃত্যুর পর কারো সঙ্গেই পারতপক্ষে কথা বলতে তাঁর ভাল লাগে না, একা একা চুপচাপ শুয়ে থাকতেই তিনি হয়ত পছন্দ করেন। খুব সম্ভব এমন নির্জনতা তাঁর কাম্য যাতে স্বামীর কথা তিনি নির্বিঘ্নে ভাবতে পারেন। একজন সৎ শ্রদ্ধেয় জনপ্রিয় মানুষের সঙ্গে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছেন, এটা যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় তাঁর কাছে।

আশ্চর্য, যিনি প্রায় কাউকেই নিজের থেকে কাছে ডাকেন না, তিনিই হঠাৎ কাল রাত্তিরে বিকাশকে বলেছিলেন, আজ যেন অবশ্যই এ বাড়িতে এসে বিকাশ তাঁর ঘরে আসে, দরকারী কিছু কথা আছে।

এই মুহূর্তে প্রভাবতীর শোবার ঘরে বিশাল প্রাচীন খাটের একধারে প্রভাবতীর অর্ধেক সচল এবং অর্ধেক অসাড় শরীর কাত হয়ে পড়ে আছে। তিনি বালিশে হাতের ভর দিয়ে কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা তুলে রেখেছেন। খাটের আরেক কোণে বাজুতে হেলান দিয়ে বসে আছে জয়া, নিচে মেঝেতে একটা চেয়ারে বসেছে বিকাশ।

প্রভাবতী দু চোখে গভীর আগ্রহ নিয়ে বিকাশের দিকে তাকালেন। বললেন, 'যে জন্যে তোমাকে আসতে বলেছি, এবার সেটা শুরু ক'র।'

বিকাশকে বেশ উৎসুক দেখাল, তবে সে কিছু বলল না।

প্রভাবতী বলতে লাগলেন, 'তোমার কাকাকে ওরা খুন করল! মাথার ওপর এখন আমাদের আর কেউ নেই। পঙ্গু হই আর বিছানাতেই পড়ে থাকি, সংসারের সব ভাবনা আমাকেই ভাবতে হচ্ছে। বিশেষ করে জয়ার কথা।'

বিকাশ কিসের একটা আভাস পেল, কিন্তু এবারও চুপ করেই

রইল।

প্রভাবতী আবার বললেন, 'আমার অবস্থা ত দেখছ। তোমার কাকার মৃত্যু আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। কোনদিন আছি, কোনদিন নেই। মরার আগে জয়ার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল প্রভাবতীর। তিনি জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর খানিকটা সামলে নিয়ে ফের শুরু করলেন, 'আমার ইচ্ছে, আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই জয়ার বিয়েটা হোক। ও অবশ্য লেখাপড়া শিখেছে, কলেজে পড়ায়—সবই ঠিক। তবু আমাদের দেশ ত। যতই শিক্ষিত স্বাবলম্বী হোক, মেয়েদের মাথার ওপর একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার।'

বিকাশ এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, 'আপনি এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন? ওই ব্যাপারটা ত ঠিক হয়েই আছে।' একটু থেমে বলল, 'এই সবে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। যাক না আর কিছুদিন।'

'আমি যদি বিছানায় পড়ে না থাকতাম, এই শোকের সময় ওসব কথা তুলতামই না। রাত্তিরে জয়ার জন্যে আমার ঘুম হয় না।'

বিকাশ উত্তর দিল না।

প্রভাবতী বলেই চলেছেন, 'নিজের শরীরের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি আর বেশিদিন নেই। তার আগে এই কাজটা চুকিয়ে যেতে চাই।'

প্রভাবতীর কণ্ঠস্বর দুর্বল এবং ক্ষীণ কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন দৃঢ়তা রয়েছে। বিকাশ এবারও চুপ করে রইল।

প্রভাবতী থামেন নি, 'এখন আমাদের কালাশৌচ চলছে। বছর ঘুরবার পর বাৎসরিক না করা পর্যন্ত ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় না। তবে পুরোহিতের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, তেমন তেমন কারণ থাকলে তিন মাসেও বাৎসরিক সেরে বিয়ে দেওয়া চলতে পারে। আমার একান্ত ইচ্ছা, তিন মাসে ঐ কাজটা চুকিয়ে

তোমাদের বিয়ে দেব।'

এমনিতে একসঙ্গে এত কথা কোনদিনই বলেন না প্রভাবতী। বোঝা যায়, নিজের মৃত্যুচিন্তা, জয়ার বিয়ের কারণে দুর্ভাবনা, ইত্যাদি মিশিয়ে এক ধরনের টেনসান তাঁর মধ্যে কাজ করছে। তারই ঝোঁকে অনবরত কথা বলছেন।

বিকাশ কী বলবে ভেবে পেল না। ক'দিন আগে মহীতোষ খুন হয়েছেন, এখনও নকীপুর এই হত্যার কারণে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছে, সবার মন জুড়ে সেই আতঙ্কের ভয়াবহ টাটকা স্মৃতি। এর মধ্যে তুম করে সে যদি জয়াকে বিয়ে করে ফেলে, এ শহরের লোক কী ভাববে তার সম্বন্ধে ?

প্রভাবতী বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা হয়ে গেল। আশা করি আমার মানসিক অবস্থা আর শরীরের কথা ভেবে তুমি অনুরোধটা রাখবে। দু-একদিনের ভেতর তোমার মা-বাবার সঙ্গেও কথা বলে নিচ্ছি।'

বিকাশ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জয়া জোরে জোরে মাথা নাড়ল। বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতেই বলে উঠল, 'কী বলছ তুমি মা! বাবার খুনীরা এখনও ধরা পড়ে নি। এই অবস্থায় আমি যদি বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসি, নকীপুরের মানুষ আমার গায়ে থুতু দেবে। ওসব বিয়ে টিয়ে পরে হবে। আগে খুনীদের ফাঁসিতে ঝোলানো হোক— তারপর।'

বিকাশ দ্রুত মুখ ফিরিয়ে একবার জয়াকে দেখল। যে কথাগুলো এতক্ষণ সে ভাবছিল হুবহু তা-ই বলেছে জয়া।

প্রভাবতী মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুনীদের ত তুই ধরবি না, ধরবে পুলিশ। তারাই ওদের ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করবে। তোদের বিয়েটা হলে আমার দুশ্চিন্তা কাটে।'

জয়া উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই মোতিয়া এসে খবর দিল অনুপ এসেছে। সে তাকে মহীতোষের পড়ার ঘরে বসিয়েছে।

প্রভাবতী বিকাশকে বললেন, 'তোমরা তা হলে ও ঘরে যাও। পরে এই নিয়ে কথা হবে।'

বিকাশ এবং জয়া মহীতোষের পড়ার ঘরে চলে এল। অনুপ একটা সোফায় বসে আছে। অন্য দিন সাব-ইন্সপেক্টর শর্মা তার সঙ্গে থাকে। আজ একাই এসেছে।

বিকাশ আর জয়া অনুপের মুখোমুখি বসতে বসতে বলল. 'খুনীরা ধরা পড়ল?' অনুপ এলে রোজ এই প্রশ্নটাই করে থাকে ওরা।

রোজই অনুপ জানিয়েছে, মার্ডারারদের এখনও ধরা যায় নি। আজ বলল, 'এক কাপ চা খাওয়ান। আজ আপনাদের একটা ভাল খবর দেব।'

নিয়মিত যাতায়াতের ফলে অনুপের সঙ্গে খানিকটা বন্ধুত্বই হয়েছে বিকাশ এবং জয়ার। প্রথমত, অনুপ তাদের প্রায় সমবয়সী। তা ছাড়া, বিকাশের মতো আন্তরিকভাবেই সে চায় মহীতোষের খুনরী ধরা পড়ুক, তাদের চরম শাস্তি হোক। তার আন্তরিকতা বিকাশ আর জয়াকে মুগ্ধ করেছে।

মোতিয়াকে দিয়ে চা আনালো জয়া। কাপে চুমুক দিয়ে অনুপ জয়াকে বলল, 'আপনি সেদিন একটা ইমপর্টান্ট ক্লু দিয়েছিলেন। অবশ্য সেই অটো-রিকশাওলাও, যে আপনাদের কোর্টে নিয়ে যাবার সময় গুলিতে জখম হয়েছে—সে-ও একটা দামী ক্লু দিয়েছে। তা ছাড়া চৌধুরীজির ডায়েরিগুলো থেকেও সাংঘাতিক সব খবর পেয়েছি। এর জোরে আশা করছি কাল পরশুর মধ্যে মার্ডারারদের ধরতে পারব।'

স্নায়ুগুলো যেন টান টান হয়ে গেল জয়া আর বিকাশের। চোখমুখ ঝকঝক করছে। প্রায় একই সঙ্গে তারা চেঁচিয়ে উঠল। কারা খুনী, এখন কোথায় আছে তারা. ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল।

অনুপের মধ্যেও এক ধরনের চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। সে আবেগপ্রবণ বা সেন্টিমেন্টাল টাইপের মানুষ নয়। দায়িত্বশীল একজন

পুলিশ অফিসারের মতো সে অনেকটাই নিস্পৃহ থাকতে পারে। তবু ভাল করে লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায়, তার ভেতরেও দারুণ উত্তেজনা চলছে। প্রাণপণে সে সেটা চেপে রেখেছে।

অনুপ সামান্য হাসল। বলল, 'চৌধুরীজির খুনের ব্যাপারে আমরা ফাইনাল স্টেজে পৌঁছে গেছি। এই মুহূর্তে আপনাদের এত সব কৌতূহল মেটানো সম্ভব না। শুধু—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা থেমে গেল।

জয়া আর বিকাশ অনুপের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর তীব্র চাপা গলায় প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'শুধু কী?' প্রবল উত্তেজনায় তাদের স্বর কাঁপতে লাগল।

তক্ষুণি উত্তর দিল না অনুপ। কিছুক্ষণ কী ভেবে শেষ পর্যন্ত দ্বিধান্বিতের মতো বলল, 'আপনাদের ওপর বিশ্বাস আছে বলেই কথাটা বলছি। বাইরে যেন কোনভাবেই জানাজানি না হয়।

'না না, আমরা কাউকে বলব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'জানি বলবেন না। তবু সাবধান করে দিলাম এই জন্যে যে খুনীরা যদি কোনভাবে আমাদের প্ল্যানটা টের পেয়ে যায়, ধানবাদ থেকে পালিয়ে যাবে।'

'মার্ডারারগুলো ধানবাদে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কী করে—' বলতে বলতে চুপ করে গেল বিকাশরা। তাদের খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

বিকাশ এবং জয়ার উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না অনুপের। খুনীরা যদি ধানবাদেই থাকে, এত দূর থেকে তাদের ধরা যাবে কিভাবে? অনুপ বলল, 'আজ দুপুরেই মার্ডারারদের খবর পেয়েছি একটা সিক্রেট সোর্স থেকে। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারকে ধানবাদ পাঠানো হয়েছে। ধানবাদ পুলিশকে ওয়ারলেসে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আমাদের পুলিশ অফিসারকে সব রকম

সাহায্য করে।' একটু থেমে ফের জানালো, 'সমস্ত কিছু যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে আজ রাতের মধ্যেই খুনীরা ধরা পড়বে। নকীপুরের অফিসারটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অ্যারেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে যেন এখানে খবর পাঠায়। আশা করা যাচ্ছে, মাঝরাত বা খুব দেরি হলে শেষ রাত নাগাদ খবর এসে যাবে।'

স্নায়ুর মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে জয়ার। প্রায় রুদ্ধ গলায় সে বলল, 'খুনীরা সবসুদ্ধ ক'জন ?'

'চারজন। গুলি চালিয়েছে একজনই। তবে তাকে সাহায্য করেছে বাকি তিনজন।'

'কিভাবে ওদের খোঁজ পেলেন ?'

'সেটা পুলিশের সিক্রেট, বলা যাবে না।'

'যারা খুন করেছে, আমরা তাদের চিনি ?'

'প্লীজ এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। একটা দিন ধৈর্য ধরে থাকুন। ওনলি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। তার পর সব জানতে পারবেন। এখন গোটা ব্যাপারটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে খুনীরা আমাদের হাতের বাইরে চলে যাবে।'

অগত্যা জয়া চুপ করে গেল। তবে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অস্থিরতা চলতেই লাগল।

চা খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। আচমকা জয়াকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসল অনুপ, 'আচ্ছা, 'নকীপুর সমাচার'-এর চতুরলালজি কি চৌধুরীজির খুনের ব্যাপারে আপনাকে ইন্টারভিউ করতে এসেছিলেন ? আমি যতদূর শুনেছি—আসেন নি। সত্যি ?'

জয়া বেশ অবাকই হল। কেননা এটা জানার কথা নয় অনুপের, এ বিষয়ে তার সঙ্গে কোনদিনই কথা হয়নি। জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

'অন্য সব কাগজের করেসপনডেন্টরাও ত আসে নি।'

'না। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে ?'

অনুপ উত্তর দিল না। হঠাৎ তাকে ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'আমি যেটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়, ওরা আর 'আপনার ইন্টারভিউর জন্যে আসবে না।'

'কেন?' জয়া এবং বিকাশ দু'জনেই চমকে উঠল।

অনুপ বলল, 'ডিটেলে আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। তবে এটুকুই শুধু বলতে পারি ওই মার্ডারাররা হচ্ছে প্রফেসনাল কীলার, ওদের খুন করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছিল। আসলে যারা এদের পেছনে আছে তারা বিরাট বিরাট লোক, দারুণ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। তারা চায় না আপনার ইন্টারভিউ কাগজে বেরোক।'

'কারা এরা?' গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠল জয়া।

'আমি এখনও জানতে পারিনি, পারলেও আপনাকে বলতাম না। মার্ডারাররা ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে জেনে নেব।'

'তারা কি বলবে?'

'আশা করি। ফাঁসির দড়ি থেকে গলা বাঁচাতে হলে কনফেসান ত করতেই হবে। আমার ধারণা, কনফেসান না দেবার মতো গাড়ল তারা হবে না। তবু—'

'তবু কী?'

অনুপ বলল, 'একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে।'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কিসের দুশ্চিন্তা?'

'শেষ পর্যন্ত খুনীদের অ্যারেস্টটা করা যাবে কিনা।' একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল অনুপ, তার কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়েছে। বোঝা যায় প্রবল স্নায়বিক চাপ চলছে তার।

'মানে?' জয়া হকচকিয়ে গেল, 'এই যে বললেন ধানবাদে অফিসার পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'অফিসার পাঠিয়েছি। ধানবাদ পুলিশ আর্মড ফোর্স, ভ্যান, ওয়্যারলেস —সব রেডি করে রেখেছে। তবু যতক্ষণ না অ্যারেস্টটা হচ্ছে ততক্ষণ টেনসান কাটছে না।' বলতে বলতে উঠে পড়ল অনুপ, 'এখন চলি।

আজ রাত্তিরে আর ঘুম হবে না। যতক্ষণ না ধানবাদের খবরটা পাচ্ছি, ভীষণ রেস্টলেস লাগছে।'

বিকাশ এতক্ষণ চুপচাপ সব কিছু শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, 'আপনার কি ধারণা, মার্ডারারদের সঙ্গে এনকাউন্টার হবে?'

অনুপ হাসল, 'যারা প্রফেসানাল কীলার তারা কি সুবোধ বালকের মতো হ্যাণ্ডকাফ পরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবে? দু দিক থেকেই গুলি-টুলি চলবে। দু চারজন মারাও পড়বে কিংবা জখম হয়ে হাসপাতালে যাবে। দিস ইজ পার্ট অফ দি গেম।' দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'চৌধুরীজির খুনের পেছনে বিরাট কনস্পিরেসি আছে। বড় বড় লোক এর মধ্যে ইনভলভড্। তারাই শেষ পর্যন্ত এই অ্যারেস্টটা করতে দেবে কিনা, বুঝতে পারছি না। কোন দিক থেকে কে সুতো টানবে কে জানে।'

'তবে কি এত বড় একটা ক্রাইম করে শয়তানেরা পার পেয়ে যাবে?' গলার স্বর কাঁপতে লাগল জয়ার।

'অত হতাশ হচ্ছেন কেন? এই মার্ডারের পেছনে যারা আছে, আমি তাদের সহজে ছাড়ছি না।'

কথায় কথায় তিনজনে একতলায় সিঁড়ির মুখে চলে এসেছিল। জয়া বলল, 'ধানবাদ থেকে যত রাত্তিরেই খবর আসুক, আমাকে ফোন করে জানাবেন।'

'জানাবো।' অনুপ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগল।

আট

কাল রাত্তিরে অনুপ চলে যাবার পর আরো কিছুক্ষণ এ বাড়িতে ছিল বিকাশ। সে যখন গেল, দশটা বেজে গেছে। তারপর খেয়েদেয়ে শুতে শুতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সারারাত একটুও ঘুমোতে পারে নি। সমস্ত স্নায়ু টান টান করে জেগে থেকেছে জয়া। তার ভয় পাছে ঘুমিয়ে পড়লে টেলিফোনের শব্দ শুনতে না পায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপের ফোন আসে নি।

ভোরবেলা, সবে আবছা আবছা আলো ফুটেছে, সেই সময় উঠে পড়ল জয়া। সমস্ত রাত ঘুম না হওয়ায় মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। কপালের দু'পাশে রগ দুটো ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো সমানে লাফিয়ে যাচ্ছে। আয়নার সামনে না দাঁড়ালেও সে জানে এখন তার চোখ দুটো টকটকে লাল, আর জ্বালা জ্বালাও করছে।

বিছানা থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল জয়া। উত্তর দিক থেকে উল্টোপাল্টা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে তার স্নায়ু অনেকখানি জুড়িয়ে এল।

এখনও প্রভাবতার ঘুম ভাঙে নি। মোতিয়া রাত থাকতে থাকতেই উঠে পড়ে। আজও নিশ্চয়ই উঠেছে। রান্নাঘরে বাসনকোসনের আওয়াজে টের পাওয়া যাচ্ছে, আপাতত সে ওখানেই আছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ জয়ার চোখে পড়ল, সামনের রাস্তা দিয়ে বিকাশ আসছে। সে খুবই অবাক হল, কেননা এত সকালে কখনো আসে না বিকাশ। কী এমন ঘটতে পারে যাতে ভোরবেলাতেই সে ছুটে এসেছে! জয়া ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উদ্বেগ বোধ করল।

ততক্ষণে বাড়ির গেট খুলে সামনের বাগানে চলে এসেছে বিকাশ। একটু পর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল।

বিকাশের চুল উস্কখুস্ক, চোখ আরক্ত, চোখের কোলে কালির পোঁচ, গালে কালচে দাড়ি। বোঝাই যায়, চুলে চিরুনি লাগায় নি সে, শেভ করে নি এবং সারা রাত ঘুমোয়ও নি। সোজা এখানে চলে এসেছে।

জয়া বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি এত সকালে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঘুমোও নি।'

বিকাশ জয়ার চোখমুখ লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'না। তুমিও কি ঘুমিয়েছ?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল জয়া।

বিকাশ এবার জিজ্ঞেস করল, 'অনুপ ফোন করেছে?'

কী কারণে এত ভোরে বিকাশ ছুটে এসেছে, বোঝা গেল: ধানবাদের খবরটার জন্য তারও ঘুম হয় নি। জয়া বলল, 'না।'

'কী ব্যাপার বল তো?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তবে কি খুনীরা ধরা পড়ে নি?'

জয়া উত্তর দিল না। অবশ্য উত্তর পাবার জন্য প্রশ্নটা করে নি বিকাশ। সে ভাল করেই জানে, অনুপ যখন ফোন করে নি তখন খুনীদের সম্বন্ধে জয়ার পক্ষে কিছু জানা আদৌ সম্ভব না। এই প্রশ্নটার মধ্যে তার উৎকণ্ঠাই ফুটে বেরিয়েছে।

বিকাশ এবার বলল, 'কী করা যায় বল তো? অনুপকে ফোন করব?'

'সবে সকাল হয়েছে। আরেকটু দেখা যাক। হয়ত ধানবাদ থেকে এখনও খবর আসে নি।'

'তা হলে আমি এখন যাই। অফিসে যাবার সময় জেনে যাব।'

'আচ্ছা।'

ঠিক ন'টার সময় আবার এল বিকাশ। তখনও অনুপের ফোন আসে নি।

বিকাশ বলল, 'এখন আর অপেক্ষা করতে পারব না। ভাবছি থানায় অনুপের সঙ্গে দেখা করে অফিসে যাব।'

জয়া বলল, 'অফিসে গিয়ে আমাকে ফোন কোরো।'

'ঠিক আছে।'

দুপুরে বিকাশের ফোন এল। জয়া শ্বাসরুদ্ধের মতো মহীতোষের পড়ার ঘরে বসে ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'থানায় গিয়েছিলে?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ। সেখান থেকে এইমাত্র অফিসে এসেছি এসেই তোমাকে রিং করলাম।'

এখন বারোটা বাজে। এতক্ষণ থানায় কী করছিলে?'

'অনুপের জন্যে ওয়েট করছিলাম। তাই অফিসে আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'দেখা হল তার সঙ্গে?'

'না।'

'সে কি! কোথায় গেল সে?'

বিকাশ বলল, 'সারা রাত ধানবাদের খবরটার জন্যে থানাতেই ছিল অনুপ। তারপর সাড়ে সাতটার সময় কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে, আর ফিরে আসে নি। কখন ফিরবে, থানার কেউ বলতে পারল না। আন্দাজে কতক্ষণ বসে থাকব?'

খুবই উদ্বিগ্ন দেখাল জয়াকে। সে বলল, 'অনুপের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'ফোন করেছিলাম। ওখানেও যায় নি।'

'কোথায় যেতে পারে সে?'

'কী করে বলি? ওর বাড়ির লোকও কিছু জানে না।'

একটু চুপ করে রইল জয়া। তারপর বলল, 'থানায় ধানবাদের খবর নিয়েছিলে?'

'নিয়েছিলাম। কোন খবর নেই।'

'অদ্ভুত ব্যাপার ত।'

বিকাশ বলল, 'এখন ফোন রাখছি। অফিসের অনেকগুলো আর্জেন্ট কাজ আছে। পরে থানায় আবার খোঁজ নেব। যদি কিছু জানতে পারি, তোমাকে রিং করব।'

'আচ্ছা।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত না বিকাশ না অনুপ, কারোর ফোন এল না। অবশ্য এর ভেতর জয়া থানায় তিন চার বার খোঁজ নিয়েছে। অনুপের কোন খবর নেই। সে যেন নকীপুর থেকে কাউকে কিছু না বলে একেবারেই উধাও হয়ে গেছে। তবে থানার লোকেরা জানিয়েছে, যে অফিসারকে ধানবাদে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরে আসছে। 'খুনীরা ধরা পড়েছে কিনা'—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তারা দিতে পারে নি।

সন্ধ্যেবেলা অন্যদিনের মতোই বিকাশ অফিস থেকে সোজা মহীতোষের বাড়ি চলে এল।

প্রভাবতীর ঘরে জয়া এবং মোতিয়া ছাড়া মহল্লার আরো কেউ কেউ বসে কথা বলছিল। বিকাশ প্রভাবতীর সঙ্গে একবার দেখা করেই জয়াকে নিয়ে মহীতোষের নিজস্ব ঘরটায় চলে এল। খুনীদের অ্যারেস্ট করার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ত ছিলই, সেই সঙ্গে মিশল অনুপ সম্পর্কে প্রবল উৎকণ্ঠা। মহীতোষের খুনের সূত্রে কিছুদিন মেলামেশা করে এই তেজী সৎ সমবয়সী অফিসারটিকে খুবই ভাল লেগে গেছে জয়াদের।

অনুপ কাল জানিয়েছিল মহীতোষের হত্যাকাণ্ডের পেছনে বড় বড় প্রভাবশালী লোক রয়েছে। তাদের কেউ অনুপের ক্ষতি করল কিনা, কে জানে।

জয়ারা সোফায় বসতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ ফোন এল।

বিকাশ ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে অনুপের গলা শোনা গেল, 'কে বলছেন?'

'আমি বিকাশ।'

'ফাইন। চৌধুরীজির মেয়ে বাড়ি আছেন?'

'আছে। আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

'নকীপুর থেকেই। আপনারা—'

ফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ল বিকাশ। অনুপের কথা শেষ হতে না হতেই এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগল, 'জানেন, কাল সারা রাত আপনার জন্যে আমরা ঘুমোতে পারি নি। আজ সকাল থেকে কতবার যে থানায় ফোন করেছি, ঠিক নেই। একবার থানায় চলেও গিয়েছিলাম। কেউ আপনার সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারল না। এদিকে ভেবে ভেবে আমরা অস্থির। কোথায় গিয়েছিলেন?'

অনুপ বলল, 'আপনারা বাড়ি থেকে বেরুবেন না। আমি গিয়ে সব বলছি।'

'শুধু একটা কথা বলুন, আপনার কোন ক্ষতি হয় নি ত?'

'না না, আমি ভাল আছি। এক্ষুণি আসছি। পনের মিনিটের ভেতর পৌঁছে যাব।'

প্রবল উত্তেজনায় জয়া সোফা থেকে উঠে বিকাশের কাছে চলে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে ব্যস্তভাবে বলল, 'ফোনটা দাও, আমি একটু কথা বলব।'

বিকাশ বলল, 'লাইন কেটে দিয়েছে।' বলেই ফোনটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল।

জয়া বিকাশের কথাগুলোই শুনেছে। অনুপ কী উত্তর দিয়েছে তা শোনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে অনুপ? সারাদিন কোথায় ছিল? কী করছিল?'

বিকাশ জানালো, 'শুধু বলল, ভাল আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসছে। এসে সব বলবে।'

পনের মিনিটও লাগল না, তার আগেই একটা জীপে করে চলে এল অনুপ। জয়ারা তার জন্য শ্বাসরুদ্ধের মতো অপেক্ষা করছিল।

অনুপকে আজ যেন চেনাই যায় না। কাল, প্রায় এই সময় সে এ বাড়িতে এসেছিল, তারপর এই এল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার ওপর

দিয়ে যেন একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেছে। চুল এলোমেলো, মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি, চোখ ইঞ্চিখানেক গর্তে ঢুকে গেছে। পরনের শার্ট আর ট্রাউজার্স ময়লা, সে দুটোর ক্রীজ নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে।

অনুপের হাতে একটা মোটা কভার ফাইল। জয়ারা কিছু বলার আগেই ফাইলটা একপাশে রেখে একটা সোফায় বসে পড়ল সে। তাকে ভয়ানক ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

জয়া বলল, 'একটু কফি খান।'

অবসন্ন ভঙ্গিতে অনুপ বলল, 'হ্যাঁ, খাব। সেই সঙ্গে আর কিছু যদি দ্যান—সামথিং টু বাইট। সারা দিনে দু কাপ চা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয় নি।'

জয়া কফি, কিছু প্যাঁড়া আর খান কয়েক টোস্ট করে নিয়ে এল। চুপচাপ, প্রায় গোগ্রাসেই খেতে লাগল অনুপ। খাওয়া শেষ করে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'না, পারলাম না।' জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল সে, তার চোখেমুখে গভীর হতাশা।

জয়ার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি পলকের জন্য থমকে গেল। সে কাঁপা গলায় বলল, 'কী পারলেন না?'

'মার্ডারারদের অ্যারেস্ট করতে। হাতের মুঠো থেকে তারা বেরিয়ে গেল।' বলতে বলতে প্রায় ভেঙেই পড়ল অনুপ, 'খুনীদের ধরার সব অ্যারেঞ্জমেন্টই করে ফেলেছিলাম। ধানবাদে লোকও পাঠিয়েছিলাম কিন্তু কিছুই করা গেল না শেষ পর্যন্ত।'

সেই পুলিশ অফিসারটির কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল জয়ার। কাঁপা গলায় সে বলল, 'যে অফিসারকে পাঠিয়েছিলেন তিনি কি ওদের ধরতে পারেন নি?'

'ধরতে ঠিকই পারতেন কিন্তু ধরতে দেওয়া হল না। তাঁকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে।'

'আপনিই ত তাকে পাঠিয়েছিলেন। কে তাঁকে ফিরে আসার হুকুম

দিল ?'

'আমার মাথার ওপরে ত কর্তারা আছেন। তাঁদের কেউ।'

'কে তিনি ?'

'এ প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব না।'

এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি বিকাশ। এবার দম আটকানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এত বড় ক্রাইম করেও মার্ডারাররা পার পেয়ে যাবে ? তাদের গায়ে একটা টোকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে না ?'

বিষন্নভাবে মাথা নাড়ে অনুপ, 'আই অ্যাম হেল্পলেস, অ্যাবসোলুটলি হেল্পলেস। আরো একটা মারাত্মক খবর দিচ্ছি, শুনলে আপনারা চমকে উঠবেন।'

জয়া এবং বিকাশ, দু'জনেই উদ্বিগ্ন মুখে তাকাল। কেউ কিছু বলল না।

অনুপ বলল, 'আমাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে।'

জয়া আর বিকাশ প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ট্রান্সফার !'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রামপুরে। নতুন একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউন হয়েছে, সেখানকার থানায়।'

'কবে যেতে হবে সেখানে ?'

'কাল এখানকার চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে পরশুই রামপুরে রিপোর্ট করতে হবে।'

জয়ারা একেবারে থ। এরকম ব্যাপার ঘটতে পারে, তারা ভাবে নি। স্তব্ধ হয়ে দু'জনে পলকহীন অনুপের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনুপ আবার বলল, 'আপনারা জিজ্ঞেস করছিলেন না, সারাদিন কোথায় ছিলাম, কী করছিলাম—'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ল জয়ারা।

'ট্রান্সফারটা যাতে ঠেকানো যায়, সে জন্যে কর্তাদের বাড়ি বাড়ি পাগলের মতো আর্জি করে যাচ্ছিলাম। কত বললাম, চৌধুরীজির মার্ডার কেসটা প্রায় ফাইনাল স্টেজে এসে গেছে। খুনীদের অ্যারেস্ট করে কোর্টে প্রডিউস করি, কেসটা গুছিয়ে ঠিক করে দিই, তারপর আমাকে যেখানে খুশি ট্রান্সফার করুন। দয়া করে আমাকে শুধু একটা মাস সময় দিন।' একদমে কথাগুলো বলে থামল অনুপ।

শ্বাস টানার মতো শব্দ করে জয়া বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কি, কিছুই হ'ল না। আমাকে পরশু রামপুর যেতেই হবে।' খুবই বিপর্যস্ত দেখাল অনুপকে: সে প্রায় ভেঙেই পড়েছে।

বিকাশ হঠাৎ বলল, 'আপনি ত সবে নকীপুরে এসেছেন। দু মাসও বোধহয় পুরো হয় নি। এত তাড়াতাড়ি কি আপনাদের ট্রান্সফার করে?'

অনুপ বলল, 'তেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে অ্যাডমিনি-স্ট্রেসন ইচ্ছা করলে ট্রান্সফার করতে পারে। ওঁরা অবশ্য বলেছেন, রামপুরে ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েসন খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমার মতো একজন অফিসারের ওখানে যাওয়া দরকার।'

জয়াকে ভীষণ উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। সে বলল, 'আপনি চলে গেলে বাবার খুনের কেসটা কি চাপা পড়ে যাবে? কেউ এর দায়িত্ব নেবে না?'

'নিশ্চয়ই নেবে।'

'কে?'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেসন কাকে শেষ পর্যন্ত দ্যায়,' বলে একটু থামে অনুপ, পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'আমি এখনও কারো নাম শুনি নি।'

হতাশ ভঙ্গিতে জয়া বলল, 'সে কি আপনার মতো এত সিনসিয়ার হবে?'

অনুপ এই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'যাকেই দিক, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আপনাদের একটা কথা পরিষ্কার জিজ্ঞেস করতে চাই। চৌধুরীজির মতো মানুষকে যারা খুন করেছে, আর যারা এই খুনের পেছনে আছে—পাবলিকের কাছে তাদের এক্সপোজ করা হোক,

এটা আপনারা চান নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে কারো ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে আপনাদেরও নেমে পড়তে হবে। অবশ্য সাব ইন্সপেক্টর শর্মা এখানে রইল। সে খুবই সৎ ছেলে। সে-ও সীরিয়াসলি চায় চৌধুরীজির খুনের পেছনে যে নাটের গুরুরা আছে, ধরা পড়ুক। আমি চলে গেলে শর্মা ফ্রীলি অনেক কিছু করতে পারবে না। তবে আপনারা যে হেল্প চাইবেন পাবেন।' অনুপ বলতে লাগল, 'শুধু একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে জানাচ্ছি। এতে কিন্তু ভীষণ বিপদ আর রিস্ক আছে।'

জয়ার মুখের পেশি শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, 'যে বিপদই আসুক, আমার আপত্তি নেই। বাবার খুনীদের ধরতে হলে যত রিস্ক নেওয়া দরকার—নেব।'

'এইরকম সাহসেরই দরকার।' অনুপ বলল, 'কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, খুনীরা আসলে খুব বড় ফ্যাক্টর নয়। তাদের দিয়ে যারা বন্দুকের ট্রিগার টিপিয়েছে তারা ডেঞ্জারাস পীপল। তারা যদি বোঝে ধরা পড়বে, আপনাদের তক্ষুণি খুন করে ফেলবে।'

জয়া বলল, 'প্রাণের ভয় আমি করি না।'

ওপাশ থেকে বিকাশও বলে উঠল, 'আমিও না।'

অনুপ জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে আপনার বাবার ডায়েরি ক'টা আর এই নোটগুলো নিন।'

সোফার কোণ থেকে সেই মোটা কভার ফাইলটা তুলে, খুলে ফেলল অনুপ। বারোখানা ডায়েরি ওটার ভেতর সাজানো আছে। আর আছে ইংরেজিতে টাইপ-করা দুটো লম্বা শীট। সে বলল, 'আপনার বাবার লাস্ট ইয়ার আর কারেন্ট ইয়ারের ডায়েরি দুটো খুবই ইমপর্টান্ট। ভানুপ্রতাপ এবং তাঁর নিজের মার্ডার হবার ক্লু এর মধ্যে রয়েছে। কোন কোন পাতায় এই ক্লুগুলো পাবেন, আমি লাল কালি দিয়ে সেই সব জায়গায় আণ্ডারলাইন করে রেখেছি। আর এই কেস সম্বন্ধে ইনভেস্টিগেট করতে

গিয়ে যে পয়েন্টগুলো ভীষণ জরুরী মনে হয়েছে সেগুলো এই দুটো শীটে টাইপ করে রেখেছি। আমি ত আর সময় পেলাম না, তবে এই শীট দুটো পড়লে বুঝতে পারবেন রয়াল মার্ডারারদের ধরতে হলে কিভাবে এগুতে হবে, কোথায় কোথায় যেতে হবে।'

নিশ্বাস বন্ধ করে অনুপের প্রতিটি কথা শুনতে লাগল জয়ারা।

অনুপ আবার বলল, 'যেখানেই যাবেন একটা পাওয়ারফুল ক্যামেরা আর ছোট টেপ রেকর্ডার নিয়ে যাবেন। যা কিছু দরকারী মনে হবে টেপ করে নেবেন বা ছবি তুলবেন। এমনভাবে করবেন যাতে কেউ টের না পায়। বী ট্যাক্টফুল অ্যাণ্ড কেয়ারফুল। বার বার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, দে আর ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস অ্যাণ্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পীপল।'

জয়া জোরে শ্বাস টেনে বলল, 'আমরা নিশ্চয়ই কেয়ারফুল থাকব। কিন্তু কিভাবে শুরু করব যদি একটু বলে দ্যান—'

'সব টাইপ করা আছে। কাজে নামার আগে খুব ভাল করে ডায়েরি দুটো আর আমার নোট বার বার পড়ে নেবেন। আমার মনে হয়—'

'কী?'

'অটো রিকশার সেই ড্রাইভার মুঙ্গিলালকে দিয়ে শুরু করলেই ভাল হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করবেন। কী ধরনের প্রশ্ন করতে হবে, তার মডেল করে দিয়েছি। দেখে নেবেন—'

'সে ত হাসপাতালে ছিল।'

'এখন অনেকটা ভাল আছে। ক্রাইসিস কেটে যাবার পর হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন বাড়িতেই আছে, ওর ঠিকানাও ওই শীটেই পাবেন।'

'কিন্তু—' হঠাৎ কিছু মনে পড়তে দ্বিধান্বিতের মতো জয়া বলল, 'অটো রিকশাওলার ইন্টারভিউ 'নকীপুর সমাচার'-এ বেরিয়েছে। যতদূর মনে আছে, তাতে সে জানিয়েছে, খুনীদের চেনে না। তার কাছে গিয়ে কিছু লাভ হবে?'

অনুপ বলল, 'আপনাদের যখন যেতে বলছি তখন নিশ্চয়ই কারণ

আছে। অবশ্যই যাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা, ডায়েরি আর আমার নোট খুব সাবধানে রাখবেন। ওগুলো চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

'কেন?' বেশ অবাকই হয় জয়া।

অনুপ হাসে, 'যার মধ্যে খুনের প্রমাণ বা ক্লু আছে, সেটা কি অন্যের হাতে থাকা নিরাপদ?'

'বুঝেছি।'

'অনেক রাত হল। এবার চলি।' অনুপ উঠে দাঁড়ায়

বিকাশ বলে, 'রামপুর চলে যাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে আর কি দেখা হবে না?'

'নিশ্চয়ই হবে। এটা ছিল আমার প্রথম মেজর কেস। কিন্তু মার্ডারারদের ধরার আগেই আমাকে এখান থেকে তাড়ানো হচ্ছে।' অনুপের হতাশা কেটে গিয়ে আচমকা তার চোখেমুখে দুর্জয় ক্রোধ ফুটে বেরোয়। চোখদুটো ধকধক করতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে যায়, 'আপনারা কি মনে করেন, এই ডিফিট এই ইনসাল্ট আমি মেনে নেব? নেভার। রামপুর থেকেই আমি আমার কাজ করে যাব। রোজ রাত ন'টায় আপনারা ঘরে থাকবেন। ওই সময়টা ফোন করে জেনে নেব—সারাদিনে কতটা কী করলেন। মনে রাখবেন, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।'

অনুপের ট্রান্সফারের কথা শুনে জয়ারা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। খুব আন্তরিক গলায় জয়া বলল, 'কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।'

'কৃতজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল অনুপ, 'আমাদের সোসাইটি কী জঘন্য হয়ে গেছে ভাবুন। চৌধুরীজির মতো মানুষকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি। এখন তাঁর খুনীরা যদি রেহাই পেয়ে যায় একটা স্বাধীন দেশের পক্ষে তাঁর চেয়ে বড় লজ্জার

আর কিছু থাকতে পারে না।'

জয়ারা কিছু বলল না। মুগ্ধ চোখে এই সৎ ঋজু সাহসী অফিসারটির দিকে তাকিয়ে রইল।

অনুপ আর দাঁড়াল না। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'শর্মাকে বলে গেছি, সে আপনাদের সঙ্গে রেগুলার দেখা করবে। আপনাদের সঙ্গে আমার যে যোগাযোগ আছে, শর্মা ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে।

'আচ্ছা।'

অনুপকে নিচের বাগানে জীপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার পড়ার ঘরে ফিরে এল জয়ারা। তারপর মহীতোষের ডায়েরির লাল আণ্ডারলাইন-করা পাতাগুলো এবং অনুপের টাইপ-করা নোট পড়তে লাগল। একবার নয়, বার বার পড়ল। পড়তে পড়তে শ্বাস আটকে আসতে লাগল তাদের। মনে হল একটা অন্ধকার পিছল সুড়ঙ্গের মধ্যে তারা ঢুকে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বার করে দিয়ে জয়া বলল, 'কাল তা হলে মুঙ্গিলালের বাড়ি যাওয়া যাক।'

বিকাশ বলল, 'নিশ্চয়ই। কখন যাবে?'

'তোমার ত অফিস আছে। ছুটির পর সন্ধ্যেবেলা যাব।'

বিকাশ একটু ভেবে বলল, 'সন্ধ্যেবেলা গেলে কতক্ষণ লেগে যাবে বুঝতে পারছি না। অনুপ বলে গেল রাত ন'টায় রোজ ফোন করবে। তার ভেতর যদি ফিরে আসতে না পারি?'

'তা হলে কী করবে?'

'ভাবছি কাল অফিসে যাব না। একটা ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে নেব। সকালেই, ধরো ন'টা সাড়ে ন'টায় মুঙ্গিলালের সঙ্গে দেখা করব।'

'সেই ভাল।'

নয়

পরের দিন সকালে আটটার ভেতরেই মহীতোষের বাড়ি চলে এল বিকাশ। একটা ছোট ফরেন টেপ-রেকর্ডার নিয়ে এসেছে সে। আর এনেছে একটা পাওয়ারফুল ক্যামেরা। অর্থাৎ অনুপ যা যা বলেছিল তা-ই এনেছে। টেপ-রেকর্ডারটা ব্যাটারিতে চলে। সেটা এত ছোট যে পকেটে ফেলে রাখা যায়। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পকেটে হাত পুরে সুইচ টিপলেই অন্যের ভয়েস টেপ করে নেওয়া যাবে। অবশ্য ক্যামেরাটা ওভাবে কাজে লাগানো অসম্ভব. ওটাকে পকেটে বা ব্যাগে লুকিয়ে রেখে ছবি তোলা যাবে না। প্রকাশ্যে সবার চোখের সামনেই যা করার করতে হবে।

বিকাশ বলল, 'চল এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।'

অনুপের নোটে মুঙ্গিলালের ঠিকানা আছে। সে থাকে নকীপুরের শেষ মাথায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরীয়া ছাড়িয়ে নতুন একটা মহল্লায়। জায়গাটা এখান থেকে মাইল আটেক দূরে। অটো রিকশায় গেলেও বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে।

জয়া বলল, 'হ্যাঁ চল।'

ওরা বেরুতে যাবে, ঠিক সেই সময় এম এল এ রামনেহাল দুবে তাঁর পার্টির কিছু লোকজন সঙ্গে করে হঠাৎ এসে পড়লেন। মহীতোষের শ্রাদ্ধের পর আজই প্রথম তিনি এ বাড়িতে এলেন। অবশ্য মহীতোষের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি যে প্রায়ই জনসভা করে যাচ্ছেন, সে খবর জয়ারা নিয়মিত পাচ্ছে। তাঁর লোকেরা এসে সেই সব সভায় নিয়ে যাবার জন্য তাকে এবং প্রভাবতীকে টানাটানিও করছে।

রামনেহালদের মহীতোষের পড়ার ঘরে বসিয়ে জয়া খুবই বিনীত-ভাবে বলল, 'আমরা একটু বেরুচ্ছি। কোন দরকারে এসেছেন কি?'

এমনভাবে সে ইঙ্গিতটা দিল যাতে কাজের কথা থাকলে রামনেহাল যেন তাড়াতাড়ি সেরে নেন।

রামনেহাল সামান্য বিব্রত হলেন। বললেন, 'ও, বেরুচ্ছেন। আমি একটা জরুরী ব্যাপারে এসেছি। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না।'

জয়া কিছু বলল না, উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল।

রামনেহাল জিজ্ঞেস করলেন, 'চৌধুরীজি কবে মারা গেছেন মনে আছে।'

জয়া বলল, 'তিন সপ্তাহ আগে।'

'কারেক্ট।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন রামনেহাল, 'ঠিক মনে রেখেছেন দেখছি।'

জয়া ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হচ্ছিল। তার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেবার জন্য লোকটা এই সাত সকালে হাজির হয়েছে নাকি? সে উত্তর দিল না।

রামনেহাল এবার বললেন, 'দেখুন বহেনজি, পুলিশের এফিসিয়েন্সিটা একবার ভাল করে মার্ক করুন। এত বড় একটা লোককে খুন করা হল ওপেন ডে লাইটে, লেকিন থ্রী উইকসেও মার্ডারারদের অ্যারেস্ট করতে পারল না। আমরা কোন দেশে আছি!' রামনেহালের কণ্ঠস্বরে আক্ষেপ ক্রোধ এবং ধিক্কার ফুটে বেরুল। তিনি থামেন নি; সমানে বলতে লাগলেন, 'আমরা ভেবে দেখেছি শুধু জনসভা করে ফায়দা নেই। মীটিং টীটিং খুবই মামুলি ব্যাপার হয়ে গেছে। ঐরু-গৈরু নাথু-সাথুরাই আজকাল মীটিং ডাকে, মাইক ফাটিয়ে চিল্লাচিল্লি করে। লেকিন কেউ তা গ্রাহ্যই করে না। তাই ভাবছি অন্যভাবে গভর্নমেন্টের মাথায় খামি পেরেক ঢোকাবো।' দাঁতে দাঁত ঘষলেন রামনেহাল।

তাঁর কথা বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল জয়া।

রামনেহাল বললেন, 'আমরা ঠিক করেছি, নেক্সট উইক থেকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোটা লাগাতার ঘেরাও করে রাখব। এই 'কারিক্রম' চলতেই থাকবে, যদ্দিন না খুনীরা ধরা পড়ছে। দাওয়াই

ছাড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হুঁশ হবে না। আপনি কী বলেন?'

পদ্ধতিটা মোটামুটি পছন্দই হল জয়ার। আজকাল নিয়ম অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে কোন কাজ হয় না। সব জায়গায় অদৃশ্য সুতো টানাটানি চলছে। তার ফলে অনেক কিছু বানচাল হয়ে যায়। এই টানেই অনুপকে চল্লিশ মাইল দূরে ছিটকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। হৈ চৈ বাধিয়ে চারদিক তোলপাড় করে ফেলতে না পারলে এখন কারো কানেই জল ঢোকে না। ন্যায্য, সঙ্গত দাবিও চাপা পড়ে যায়। রামনেহাল যে প্রক্রিয়ার কথা ভাবছেন হয়ত তাতেই শেষ পর্যন্ত কাজ হবে।

জয়া বলল, 'আপনি পীপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের ব্যাপার ভাল বোঝেন। কী করলে কাজ হবে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।'

'আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে।'

মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল জয়া। নিশ্চয়ই বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে রামনেহাল ছুবে এসেছেন। সতর্ক চোখে তাঁকে লক্ষ্য করতে করতে জয়া বলল, 'কিসের আর্জি?'

'আমাদের ইচ্ছা, আপনি আমাদের সঙ্গে এই ঘেরাওতে থাকুন। আপনার মাকেও অনুরোধ করতাম। তিনি অসুস্থ বলে কষ্ট দেব না। কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না, আপনাকে থাকতেই হবে. ধরুন এ ব্যাপারে আপনিই হবেন আমাদের লীডার।'

উদ্দেশ্যটা আর অস্পষ্ট নেই। সোয়া চার মাস পরের সেই অ্যাসেম্বলি ইলেকসান. জয়া বলল, 'দেখুন আমি পলিটিকস করি না। এই ব্যাপারে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই।'

রামনেহাল বোঝাতে চাইলেন, 'চৌধুরীজির হত্যায়ারাদের (খুনীদের) ধরার ব্যাপারে কোনরকম রাজনীতি নেই। আমরা পলিটিক্যাল পার্টির লোক, এটা ভুলে যান। মনে করুন, নকীপুরের আমরা সাধারণ মানুষ, দেশের সৎ নাগরিক। যারা চৌধুরীজিকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত, যারা তাঁর খুনীদের শাস্তি চায়, আমরা সেই দলের।'

চমৎকার কথা বলতে পারেন রামনেহাল। রাজনীতিকদের এটা একটা বিরাট গুণ—প্লাস পয়েন্ট। জয়াকে বেশ দ্বিধান্বিত দেখাল। যদিও সংশয়টা আছেই, তবে এখন সেটা তেমন জোরালো নয়। সে বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'নিশ্চয়ই ভাববেন। ঘেরাও শুরু হচ্ছে নেক্সট উইকে। তার মধ্যে ভাবুন। পরে আপনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন রামনেহাল, 'এখন চলি, আপনাদের বিরক্ত করে গেলাম।'

'না না, একেবারেই না। আপনার মতো বিখ্যাত মানুষ আমাদের বাড়ি দয়া করে এসেছেন, এ তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।' প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলল জয়া।

রামনেহালরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জয়ারাও বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে যখন তারা অটো রিকশা খুঁজছে সেই সময় একটা জীপ আচমকা সামনে এসে দাঁড়াল। জীপটার ফ্রন্ট সীটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন হরকিষণ শাস্ত্রী। পেছনের লম্বা সীট দুটোয় তাঁর দলের ক'জন ওয়ার্কার। জীপের মাথায় ওঁদের পার্টির ফ্ল্যাগ উড়ছে।

হরকিষণ বিশাল মাংসল শরীর নিয়ে নেমে আসতে আসতে বললেন, 'আরে বহেনজি, আপনারা এখানে!'

জয়া বলল, 'একটা দরকারী কাজে এক জায়গায় যাচ্ছি।'

'আমরাও জরুরী কাজেই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। আর দু-এক মিনিট দেরি করলে দেখা হতো না। এতদূরে ছোটাছুটিই সার হতো।'

রামনেহালের পর হরকিষণ। জয়া এবং বিকাশ বেশ অবাকই হল। পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা আজ হঠাৎ ঝাঁক বেঁধে যে হানা দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

জয়া বলল, 'প্লীজ, কিছু মনে করবেন না। এখন বাড়ি ফিরে যে আপনার সঙ্গে কথা বলব তার উপায় নেই। পরে ফোনে যোগাযোগ

করে নেব।'

'আমার কাজটা এক সেকেণ্ডের।' হরকিষণ এরপর ব্যস্তভাবে যা বলল তা এইরকম। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত পুলিশ মহীতোষের মার্ডারারদের পাত্তা পেল না। এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে। কেসটা আস্তে আস্তে একেবারেই চাপা পড়ে যাবে, যদি না এখনই সারা নকীপুর জুড়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করা যায়। সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবে না তখন আঙুল বাঁকাতেই হবে।

হরকিষণ জানালেন, খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ থেকেই তাঁরা 'সিগনেচার ক্যামপেন' অর্থাৎ গণস্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযানে বেরুবেন। হাজার হাজার সই যোগাড় করে আসছে সপ্তাহে তাঁরা পাটনায় হোম ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবেন। গভর্নমেন্টের ওপর চাপ না দিলে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না।

এখন হরকিষণ এবং তাঁর পার্টির একান্ত ইচ্ছা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের সময় প্রথম কয়েকটা দিন যেন জয়া তাঁদের সঙ্গে থাকে। সে সঙ্গে থাকলে এই আন্দোলনের শক্তি বাড়বে, অ্যাডমিনিস্ট্রেসনকে বাধ্য হয়ে কিছু না কিছু করতেই হবে।

রামনেহাল এবং হরকিষণের বক্তব্যে তফাৎ সামান্যই। উদ্দেশ্য হুবহু এক। যেভাবেই হোক তাঁরা নিজের নিজের পার্টির সঙ্গে জয়াকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে।

জয়া রামনেহালকে যা বলেছিল, হরকিষণকেও তা-ই বলল। এ বিষয়ে হুট করে সে কথা দেবে না, পরে হরকিষণের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে নেবে।

'ঠিক আছে, এখন তা হলে চলি। আপনার ফোনের জন্যে কিন্তু অপেক্ষা করব। নমস্তে—'

'নমস্তে—'

হরকিষণরা জীপে করে চলে গেলেন। জয়াদেরও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না, একটু পরেই অটো-রিকশা পেয়ে গেল।

দশ

নকীপুরের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরীয়া ছাড়িয়ে একটা বেঁটে পাহাড়ের তলায় বছর তিন চার আগে যে নতুন মহল্লা গজিয়ে উঠেছে সেখানে মুঙ্গিলালের ছোটখাটো বাড়ি। ঘরগুলো টালির চালে ছাওয়া, দেয়ালগুলো ইটের। সামনের দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কিছু আনাজ ফলানো হয়েছে। রয়েছে লম্বা লম্বা ক'টা পেঁপে গাছ আর আছে একটা ঝাড়ালো রেন-ট্রি।

তিন চারটে আধ-ন্যাংটো বাচ্চা বাগানে হুটোপুটি করছিল। একটা শক্ত গড়নের মাঝবয়সী মেয়েমানুষ, সিঁথিতে মেটে সিঁদুরের লম্বা টান, হাতে এবং কপালে উল্কি, চওড়া চওড়া হাতে রুপোর কাংনা, কানে চাঁদির করণফুল—উবু হয়ে বসে ডাল বাছছিল। দেখেই বোঝা যায় সে মুঙ্গিলালের বৌ।

সামনের রাস্তায় অটো থেকে নেমে, ভাড়াটাড়া চুকিয়ে, জয়ারা ভেতরে ঢুকতেই বাচ্চাগুলোর হৈ হুল্লোড় থেমে গেল। মুঙ্গিলালের বৌ ডাল বাছা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

জয়া নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো, মুঙ্গিলালের সঙ্গে দেখা করতে চায়, বিশেষ দরকার।

'ঠহরিয়ে—' বলে ডানদিকের ঘরটায় ঢুকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল মুঙ্গিলালের বৌ। সসম্ভ্রমে বলল, 'আইয়ে।'

মুঙ্গিলালের বৌ তাদের সঙ্গে করে আবার ভেতরে গেল। ঘরটা বেশ বড় মাপের। চারপাশে সস্তা দামের খেলো আলমারি, দুটো চেয়ার, একটা ছোট টেবল, দেয়ালে পারা-ওঠা আয়না, ইত্যাদি চোখে পড়ল। মেঝেটা নোংরা। সেখানে পেচ্ছাপের দাগ, রুটির টুকরো, ভাঙা খেলনা, দলা পাকানো জামা কাপড় ছত্রাকার হয়ে আছে।

এক কোণে একটা বিরাট আকারের চৌপায়ায় ময়লা বিছানার ওপর শুয়ে আছে মুঙ্গিলাল। তার বুকে কাঁধে এবং হাতে অনেকগুলো পুরু ব্যাণ্ডেজ। ফ্যাকাসে মুখ দেখে টের পাওয়া যায় লোকটার শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে।

মুঙ্গিলাল শশব্যস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইল কিন্তু তার আগেই জয়ারা বলল, 'উঠবেন না, উঠবেন না। আপনি শুয়ে থাকুন।'

দুর্বল শরীরে যতটা সম্ভব দ্রুত চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চেহারাটা দেখে নিল মুঙ্গিলাল। তারপর বলল, 'লছমীকে মাঈ, তুরন্ত দো কুর্সি ইধর লা।'

ওর বৌ অর্থাৎ লছমীর মা চোখের পলকে দুটো চেয়ার এনে চৌপায়ার পাশে রাখল। এবার মুঙ্গিলাল বলল, 'কা রে, ঘর বিলকুল টাট্টিখানা বনা দিয়া। আভী আভী সাফা কর দে—' বলেই জয়াদের দিকে ফিরল, 'বৈঠিয়ে বহেনজি, বৈঠিয়ে বাবুসাব—'

জয়ারা বসল আর লছমীর মা কোত্থেকে একটা ঝাড়ু যোগাড় করে এনে ঘর পরিষ্কার করতে লাগল। মুঙ্গিলাল এবার স্ত্রীকে জরুরী নির্দেশ দিল, ঘর সাফ করার পর যেন 'তুরন্ত' চা বানিয়ে আনে। তারপর জয়াদের দিকে ফিরে বলল, 'কী সৌভাগ, চৌধুরীজির মতো আদমীর লড়কী আজ আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিলেন।'

জয়া বিব্রত মুখে বলল, 'এভাবে বললে আমি কিন্তু ভীষণ লজ্জা পাব।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'অনেক আগেই আপনাকে দেখতে আসা আমার উচিত ছিল, নানা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। বাবার শ্রাদ্ধ গেল এর মধ্যে। বুঝতেই পারছেন, আমার পক্ষে বাড়ি থেকে বেরুনো সম্ভব ছিল না।'

'সে তো ঠিকই।' মুঙ্গিলাল আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিল।

জয়া বলল, 'এখন কেমন আছেন?'

'রামচন্দজি আর কিষুণজির দয়ায় বেঁচে উঠেছি।' বলতে বলতে মুঙ্গিলালের মুখচোখ বিষণ্ণ হয়ে যায়, 'চৌধুরীজিও যদি বেঁচে যেতেন—'

জয়া বা বিকাশ, কেউ উত্তর দেয় না।

এদিকে ঘর সাফ করে চা বানাতে চলে যায় লছমীর মা।

মুঙ্গিলাল এবার বলল, 'বহেনজি, চৌধুরীজির মতো আদমীর মৌতে (মৃত্যুতে) নকীপুরের বহুত ক্ষতি হয়ে গেল। এমন আদমীর ওপর কেউ গোলি চালাতে পারে, এ ভাবা যায় না। ওরা মানুষ না, জানবর।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর জয়া মুঙ্গিলালের চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'এই জানোয়াররা কিন্তু এখনও ধরা পড়ে নি।'

'জানি, পুলিশ বিলকুল নিকম্মা (অকর্মণ্য) হয়ে গেছে। সরকারের উচিত এই ডিপার্টমিনকে আভি আভি তুলে দেওয়া। এদের পুষে কোন ফায়দা নেই।'

জয়া বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই চান আমার বাবার খুনীরা ধরা পড়ুক।'

'জরুর।' অশক্ত রক্তহীন শরীরে এখনও যে শক্তিটুকু তলানির মতো পড়ে আছে, গলায় সেটুকু জড়ো করে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল মুঙ্গিলাল, 'আমার ক্ষমতা থাকলে, বহেনজি ওদের ধরে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতাম, পাঁজরা গুঁড়ো না হওয়া পর্যন্ত বুকে গুখা চালিয়ে দিতাম।'

'মুঙ্গিলালজি, আপনি একটু সাহায্য করলেও কিন্তু খুনীরা ধরা পড়তে পারে।' বলে বিকাশের দিকে ফিরে চোখের কোণ দিয়ে সংকেত দিল জয়া। বিকাশের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। জয়া চাইছে, পকেটে যে টেপ-রেকর্ডারটা রয়েছে সেটা যেন চালু করে দেয় বিকাশ। সে মাথা সামান্য কাত করে জানালো টেপ-রেকর্ডারের বোতাম অনেক আগেই টিপে দিয়েছে।

এদিকে ভীষণ হকচকিয়ে গেছে মুঙ্গিলাল। সে জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে সাহায্য করব? আমি তো যাসুস (গোয়েন্দা) নই, সিরিফ এক অটোবালা।'

জয়া বলল, 'আপনাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না। খুনীদের

সম্বন্ধে আপনি যা জানেন, শুধু সেটুকু বললেই যথেষ্ট উপকার হবে।'

'আমি কিছুই জানি না বহেনজি, কিছুই জানি না। নিউজপেপার-বালারা চৌধুরীজির খুনের পর আমার কাছে এসেছিল। তাদেরও আমি এ কথা জানিয়েছি।'

'নকীপুর সমাচার'-এ আপনার ইন্টারভিউ পড়েছি। তাতে বলেছেন, খুনীদের চেনেন না। কিন্তু আমি খবর পেয়েছি, আপনি ওদের চেনেন।'

'নেহী নেহী।' মুঙ্গিলাল চমকে উঠল। এতক্ষণ কাত হয়ে শুয়ে ছিল সে। আহত দুর্বল শরীরটাকে এক ঝটকায় টেনে তুলে উঠে বসল। বলল, 'কে বলেছে আপনাকে এসব! ঝুট বহেনজি, বিলকুল ঝুট।'

'ঝুট না, সত্যি।' চৌপায়ার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে সোজা মুঙ্গিলালের চোখের দিকে তাকাল জয়া, 'আপনি খুনীদের চেনার কথা যাঁকে বলেছেন তিনিই আমাকে জানিয়েছেন।'

চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়ল মুঙ্গিলালের। সে বলল, 'কৌন—পুলিশ অফসর অনুপজি?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে জয়া।

স্নায়ুগুলো যেন শিথিল হয়ে এল মুঙ্গিলালের। দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁপা গলায় সে বলল, 'লেকেন অনুপজি আমাকে জবান দিয়েছিলেন, এ কথা গোপন রাখবেন, কাউকে বলবেন না।'

'না বলে ওঁর উপায় ছিল না।' জয়া বলতে লাগল, 'আমরা দু'জনেই শুধু জেনেছি। কথা দিচ্ছি, আর কেউ জানতে পারবে না।'

মুখ থেকে হাত নামায় মুঙ্গিলাল। বেশ অবাক হয়েই শুধোয়, 'অনুপজির উপায় ছিল না কেন?'

'ওঁকে নকীপুর থেকে রামপুরে ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

এ খবরটা মুঙ্গিলালের কাছে একেবারেই নতুন। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'পরশুও অনুপজি আমাদের কোঠিতে এসেছিলেন। তখনও তো বলেন নি ট্রান্সফার হবেন।'

'পরশু জানতেন না। কাল ট্রান্সফারের অর্ডার পেয়েছেন। আজ

সকালে রামপুর চলে গেছেন।' জয়া বলল।

অনেকক্ষণ থ হয়ে বসে থাকে মুঙ্গিলাল। ব্যাপারটা তার কাছে এতই বিস্ময়কর যে কী বলবে, ভেবে পায় না। এক সময় জিজ্ঞেস করে, 'কেন ট্রান্সফার হলেন অনুপজি?'

'জানি না।'

হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল মুঙ্গিলালের। সে বলল, 'চার সাল আগে এরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল।'

'কী ব্যাপার?' জয়া জিজ্ঞেস করে।

মুঙ্গিলাল বলতে থাকে, 'এইরকম একটা মার্ডার হয়েছিল ওই সালে। বহোত জবরদস্ত পুলিশ অফসর ছিলেন তখন নকীপুরে। বিলকুল অনুপজি য্যায়সা। লেকেন হত্যায়ারা যখন ধরা পড়বে পড়বে, তখন কী হল কে জানে, অফসরকে চৌবিশ ঘণ্টার নোটিশে ট্রান্সফার করে দিল।'

জয়া চকিত হয়ে উঠল, 'তাই নাকি?' আরো একজন পুলিশ অফিসারকেও যে খুনের তদন্তে বেশি উৎসাহ নিয়ে অনুপের মতোই নকীপুর ছাড়তে হয়েছিল, সে তা জানতো না।

'হ্যাঁ বহেনজি।' মুঙ্গিলাল বলতে লাগল, 'সেই অফসরও চলে গেলেন, আর কেসটা বিলকুল চাপা পড়ল। অনুপজিকে যে সরানো হল, এর মধ্যে জরুর গোলমাল আছে। জরুর কোন বড়ে আদমী চায় না, চৌধুরীজির হত্যায়ারা ধরা পড়ুক। এই কেসটাও কি চাপা পড়ে যাবে বহেনজি?'

'যাতে না পড়ে সেই জন্যেই তো আপনার কাছে এলাম। বলুন কারা আমার বাবাকে খুন করেছে।'

আবেগের ঝোঁকে অনেকখানি বলে ফেলেছে মুঙ্গিলাল। মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি বহোত গরীব আদমী বহেনজি, অটো চালিয়ে কোনরকমে বেঁচে আছি। আমার কিছু হলে সমসার একেবারে ভেসে যাবে। বালবাচ্চা আর আমার ঘরবালী ভুখা মরবে।'

এর মধ্যে লছমীর মা চা নিয়ে এসেছিল। জয়া বিকাশ এবং মুঙ্গিলালকে একটা করে কাপ দিয়ে কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে এখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর সমানে চোখের ইশারায় স্বামীকে মহীতোষের খুনীদের সম্পর্কে মুখ খুলতে বারণ করছে।

খুবই দোটানায় পড়ে গেছে মুঙ্গিলাল। তাকে দেখে বোঝা যায় এ ব্যাপারে নিজের সঙ্গে তার যেন একটা যুদ্ধ চলছে। বেশ কিছুক্ষণ পর জোরে শ্বাস টেনে সে আচমকা বলে ফেলল, 'যো আদমী চোধুরীজিকে খুন করেছে তার নাম চুন্না। সে বাঁ হাতে বন্দুক চালায়।'

জয়া নিজেও লোকটাকে বাঁ হাতে গুলি চালাতে দেখেছে।

অনুপের নোটে আর মহীতোষের ডায়েরিতেও এই চুন্নার কথা লেখা আছে। অনুপ অবশ্য এর নাম জানতে পেরেছে মুঙ্গিলালের কাছে। মহীতোষ তাঁর ডায়েরির এক জায়গায় এক বাঁ-হাতি বন্দুকবাজের কথা লিখেছেন—সে ভানুপ্রতাপ রায়কে গুলি করে খুন করেছে এবং এই হত্যাকাণ্ড মহীতোষ নিজের চোখে দেখেছেন। পরে হত্যাকারী সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আবার লিখেছেন—লোকটার নাম চুন্না, একজন নোটোরিয়াস এবং প্রফেশনাল খুনী। ক্র্যাকশট।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভানুপ্রতাপ এবং মহীতোষের হত্যাকারী একই লোক। জয়া জিজ্ঞেস করল, 'আর যে লোকটা মোটর সাইকেল চালিয়ে খুনীকে নিয়ে এসেছিল তার নাম কী?'

মুঙ্গিলাল বলল, 'জানি না বহেনজি।'

তার মুখ দেখে জয়ার মনে হল, মিথ্যে বলছে না।

এতক্ষণ একদৃষ্টে মুঙ্গিলালকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল বিকাশ। একটা কথাও বলে নি। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'চুন্নাকে আপনি চিনলেন কী করে?'

'আমি অটোবালা। নানা জায়গায় আমাকে যেতে হয়। ওর কথা অনেকের কাছে শুনেছি। বার কয়েক দেখেছিও।' বিকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুঙ্গিলাল বলে।

বিকাশ এবার বলল, 'নিউজপেপারে আপনি ত এর কথা বলেন নি।'

'ডরে বলি নি বাবুজি।'

'অনুপজিকে তা হলে বললেন কেন?'

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে মুঙ্গিলাল বলে, 'পরমাত্মা বলতে বলল যে। না বললে পাপ হত, অন্যায় হত। তা ছাড়া অনুপজির ওপর ভরসা ছিল, আমার কথা জানাজানি হবে না।'

জয়া বলল, 'আমাদের ওপরও ভরসা রাখুন। আপনি বিপদে পড়েন, এমন কিছু কি করতে পারি?'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর জয়া জিজ্ঞেস করে, 'চুন্না থাকে কোথায়?'

মুঙ্গিলাল বলল, 'শুনেছি, চৌধুরীজি আর আমার ওপর গুলি চালাবার পর সে নকীপুর থেকে ভেগেছে।'

'ওর সম্বন্ধে আর যা যা জানেন, দয়া করে বলুন।'

'যা বলেছি তার বেশি কিছু আমার জানা নেই।' বলতে বলতে কিছু মনে পড়ে যায় মুঙ্গিলালের, 'তবে—'

গভীর ঔৎসুক্যে আরো ঝুঁকে আসে জয়া। বলে, 'তবে কী?'

'কদমপুরায় যে 'নবরং হোটেল' আছে তার ম্যানেজার সম্পর্কে আমার চাচেরা ভাই। লগভগ আমারই বয়সী। তার নাম ধরতীপ্রসাদ। আদমী বহোত সাচ্চা। আপনারা তার সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

অনুপের নোটে ধরতীপ্রসাদ বা 'নবরং হোটেলে'র কথা নেই। এটা নতুন তথ্য। জয়া বলল, 'এ সব কথা কি আপনি অনুপজিকে বলেছেন?'

'না। তখন মনে পড়ে নি।' বলতে বলতে গলার স্বর পাল্টে যায় মুঙ্গিলালের, 'বহেনজি বাবুজি, বহোত হোঁশিয়ার। ঐ হোটেলটা বুরা জায়গা। ওখানে বসে ধরতীপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। বাইরে কোথাও নিয়ে যাবেন।'

'তা না হয় নিয়ে যাব। কিন্তু হোটেলটাকে খারাপ বলছেন কেন?'

'নানা কিসিমের আদমী ওখানে আসে।

এবার মুঙ্গিলাল যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। বহেনজি এবং বাবুজি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ঐ হোটেলে দু-একদিন পা দিলেই বুঝতে পারবেন, কী ধরনের লোকজন ওখানে যাতায়াত করে। শুধু একটা কথাই সে বহেনজিদের জানিয়ে দিতে চায়, চুন্না বন্দুকের ঘোড়াটাই শুধু টিপেছে! দু-তিনশো রুপাইয়া পেলে ও মানুষ খুন করতে পারে। ওটাই ওর ব্যওসা। লেকেন এর পেছনে যারা আছে তারা খতরনাক (বিপজ্জনক) আদমী। হোঁশিয়ারিটা তাদের জন্যই।

স্নায়ুগুলো টান টান করে শুনে যাচ্ছিল জয়া। বোঝা যাচ্ছে, ভাড়াটে খুনীর পেছনে যে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ভয়ঙ্কর কেউ আছে, সেটা টের পেয়েছে মুঙ্গিলাল।

ঝোঁকের মাথায় কথা বলে যাচ্ছে মুঙ্গিলাল। জয়া সেই সুযোগটা নিতে চাইল। বলল, 'কারা চুন্নাকে দিয়ে খুনটা করিয়েছে, বলতে পারেন?'

মুঙ্গিলাল বলল, 'জানি না বহেনজি। সচ্চিই জানি না। বিশোয়াস করুন।' জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল সে।

জয়া একটু ভেবে বলল, 'আন্দাজও করতে পারেন না?'

'নহী।'

মুঙ্গিলালের এই উত্তরটা সত্যি কিনা, সে সম্বন্ধে জয়ার মনে খানিকটা সংশয় থেকে গেল। সে বলল, 'আপনি অসুস্থ মানুষ। অনেকক্ষণ বিরক্ত করে গেলাম। এখন বিশ্রাম করুন, আমরা চলি। দরকার হলে আবার আসব।'

মুঙ্গিলাল বলল, 'জরুর। গরীবের এই কোঠিকে আপনা ঘর মনে করে আসবেন।'

জয়ারা উঠে পড়ল।

এগার

মুঙ্গিলালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অটো বা সাইকেল রিকশার জন্য চারদিকে তাকাতে লাগল জয়ারা। কিন্তু কিছুই প্রায় চোখে পড়ছে না। নকীপুরের এধারে গাড়িটাড়ি কমই আসে।

বিকাশ বলল, 'চল, সামনের দিকে হাঁটতে থাকি, কিছু পেলে উঠে পড়ব।'

'সেই ভাল—' জয়ারা রাস্তা ধরে মেইন টাউনের দিকে হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতে বিকাশ বলল, 'মুঙ্গিলালের কাছ থেকে খুব ইমপর্টান্ট খবর পাওয়া গেছে। কী করবে, এখনই 'নবরং হোটেলে' যাবে?'

ঘড়ি দেখে জয়া বলল, 'সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। এখন থাক। বিকেলে ওখানে যাব।'

'ধরতীপ্রসাদের কাছে যাবার আগে কোন কোন পয়েন্টে প্রশ্ন করা দরকার, ঠিক করে নিতে হবে। হুট করে হাজির হয়ে এলোপাথাড়ি কথা বলে লাভ নেই।'

মিনিট পাঁচ সাতেক হাঁটার পর ওরা একটা অটো-রিকশা পেয়ে যায়। সেটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বারোটা বেজে গেল।

ঠিক চারটেয় আবার অটো-রিকশা করে বেরিয়ে পড়ে জয়ারা।

চকবাজারের চৌরাস্তা থেকে ডান দিকে ঘুরে খানিকটা গেলে কোর্ট। আর বাঁ দিকে গেলে কদমপুরা।

'নবরং হোটেল' খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয় না। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় হোটেলটা অনেক বার চোখে পড়েছে জয়াদের। তবে বিকাশ বা জয়া কখনো ভেতরে ঢোকে নি।

'নবরং হোটেল' মোটামুটি মাঝারি মাপের। সামনের দিকে

রেস্তোরাঁ, পেছনে তেতলা বাড়িতে বোর্ডারদের থাকার ব্যবস্থা।

হোটেলটা দারুণ চালু। সারাক্ষণ ভনভনে মাছির মতো মানুষের ভিড় লেগে আছে। বেশির ভাগই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরীয়ার লোক এখানে খেতে আসে, আর আসে লরী বা বিরাট বিরাট ট্রাকের ড্রাইভাররা। কলকাতা থেকে নর্থ ইণ্ডিয়ায় যে হাইওয়ে চলে গেছে তার খুব কাছেই কদমপুরা। এখানে লরীওলারা গাড়ি থামিয়ে পেট্রোল পাম্প থেকে ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে নেয়, আবার 'নবরং হোটেলে' এসে রোটি-মাংস-তড়কা বা সব্জিতে পাকস্থলী বোঝাই করে হাইওয়ে ধরে লম্বা দৌড় লাগায়। এই সব ট্রাক-ড্রাইভার এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের ওয়ার্কারদের হাতে অঢেল কাঁচা-পয়সা।

প্রচণ্ড চালু হলেও হোটেলটার বেশ বদনাম আছে। শোনা যায়, নানা টাইপের অ্যান্টিসোসাল এলিমেন্টও নাকি এখানে নিয়মিত আসে, বিশেষ করে রাতের দিকে। পুলিশ তাদের খোঁজে মাঝে মাঝেই ওখানে হানা দেয়।

'নবরং হোটেলে'র সামনে এসে অটো-রিকশা থেকে নেমে পড়লো জয়ারা। অটোওলাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বিকাশ জয়াকে বলল, 'তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আগে গিয়ে ধরণীপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলি। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।'

এই হোটেলের সঙ্গে যে দুর্নাম জড়িয়ে আছে, খুব সম্ভব তার কথা ভেবেই বিকাশ জয়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে না। প্রথম সে গিয়ে ভেতরের পরিবেশটা দেখে আসতে চায়। তেমন বুঝলে জয়াকে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া মহীতোষ চৌধুরীর মেয়েকে এ শহরে অনেকেই চেনে। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে তাকে ওখানে ঢুকতে দেখলে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে। তাই সতর্কভাবে এগুনোই ভাল।

জয়া বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গেই যাব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না।'

বিকাশ বলল, 'কিন্তু—' কথা শেষ না করেই সে থেমে গেল।

তার দ্বিধার কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না জয়ার। সে বলে, 'ওখানে যারা বসে খাচ্ছে তারা মানুষই ত। আমাকে কেউ খেয়ে ফেলবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জয়াকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল বিকাশ। প্রচুর লোকজন এধারে ওধারে বসে খাচ্ছে। তবে এই বিকেলবেলায় ভিড়টা তেমন গিসগিসে নয়। কোণের দিকে দু-একটা টেবল এখনও ফাঁকা পড়ে আছে।

এই রেস্তোরাঁয় মহিলা টহিলা বিশেষ একটা ঢোকে না, বিশেষ করে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা এটা এড়িয়েই চলে।

যারা খাচ্ছিল, চকিত হয়ে জয়ার দিকে তাকাল। এদের কেউ কেউ জয়াকে চেনে বলে মনে হল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কিছু বলাবলি করতে লাগল।

জয়ার কোন দিকে লক্ষ্য নেই। সে নীচু গলায় বিকাশকে বলল, 'কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও, ধরতীপ্রসাদকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

বিকাশ জানালো, 'এভাবে হুট করে জানতে চাওয়াটা ঠিক হবে না। আগে এক কাপ করে চা খাওয়া যাক। যে বয় চা সার্ভ করবে তাকে জিজ্ঞেস করব।'

ওরা যখন ডানদিকের কোণে একটা ফাঁকা টেবলে বসতে যাচ্ছে সেই সময় একটা অল্পবয়সী বয় প্রায় ছুটতে ছুটতে পাশে এসে দাঁড়াল। সসম্ভ্রমে বলল, 'আইয়ে মেরা সাথ—'

বেশ অবাকই হল জয়ারা। বিকাশ বলল, 'কোথায় যাব?'

বয়টা গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে বলল, 'মানিজার সাব আপলোগকো মেরা সাথ যানে বোলা।'

ভেতরে ভেতরে বিকাশ এবং জয়া চমকে উঠল। মুঙ্গিলাল জানিয়েছে, ধরতীপ্রসাদ এই হোটেলের ম্যানেজার। বয়টা কি তার কথাই বলছে? নিশ্চিত হবার জন্য জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাদের

ম্যানেজার ?'

'ধরতীপরসাদজি।'

যার জন্য এই কুখ্যাত হোটেলে আসা সে-ই যখন ডাকছে তখন আর চা খেয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। জয়া বিকাশের চোখের দিকে তাকাল। বিকাশ ইঙ্গিতটা বুঝল। বলল, 'চল...' বয়টাকে বলল, 'কোথায় যেতে হবে ?'

বয়টা বলল, 'নজদিগ. আইয়ে না—'

রেস্তোরাঁর পেছন দিকে, একেবারে গা ঘেঁষেই হোটেলের তেতলা বিল্ডিং। এরই দোতলায় ম্যানেজারের চেম্বার। চেম্বারটা এমন জায়গায় যেখান থেকে বিরাট কাচের জানালা দিয়ে রেস্তোরাঁ এবং হোটেলে কারা আসছে কারা যাচ্ছে, সব দেখা যায়। অর্থাৎ ম্যানেজারের চোখে ধুলো ছিটিয়ে এখানে কিছু করার যো নেই।

বয়ের সঙ্গে ম্যানেজারের চেম্বারের কাছে আসতেই একজন মধ্যবয়সী মাঝারি চেহারার লোক শশব্যস্তে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট, পাতলা চুল কিছুটা এলোমেলো। ভরাট লম্বাটে মুখ পরিষ্কার কামানো। দেখেই টের পাওয়া যায়, ধরতীপ্রসাদ মানুষটি বেশ ভদ্র।

হাতজোড় করে খুবই বিনীত ভঙ্গিতে ধরতীপ্রসাদ বলল, 'আইয়ে আইয়ে—' জয়াদের সঙ্গে করে চেম্বারের ভেতর নিয়ে গেল সে। বোঝা যাচ্ছে, ধরতীপ্রসাদ জয়াদের চেনে।

চেম্বারের মাঝখানে আধখানা বৃত্তের আকারে গ্লাস-টপ টেবল। সেটার ওধারে ধরতীপ্রসাদের জন্য একটা গদি-মোড়া রিভলভিং চেয়ার। এধারে আরো কটি চেয়ারও সাজানো রয়েছে।

এগুলো ধরতীপ্রসাদের দর্শনপ্রার্থীদের জন্য। দেয়াল ঘেঁষে ভারী ভারী কটা স্টীলের আলমারি। টেবলে দুটো টেলিফোন, টেবল-ক্যালেণ্ডার, গাদা খানেক প্যাড, পেন, ডট-পেন এবং অগুনতি ফাইল।

জয়াদের বসিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল ধরতীপ্রসাদ। বয়টা চলে

যায় নি, সে-ও চেম্বারের ভেতরে চলে এসেছিল। একধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ম্যানেজার সাবের হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছে।

ধরতীপ্রসাদ জয়াদের উদ্দেশে বলল, 'কী আনাবো বহেনজি, চা না কফি?'

'যা আপনার ইচ্ছে।' জয়া বলল।

ধরতীপ্রসাদ এবার বয়টাকে তিন কাপ কফি এবং দু প্লেট গরম কাটলেট আনতে বলল।

জয়া ব্যস্তভাবে বলল, 'শুধু কফি হলেই চলবে। আর কিছু দরকার নেই।'

জয়ার আপত্তি কানেই তুলল না ধরতীপ্রসাদ, 'তাই কখনো হয়! এই পয়লা আপনারা দয়া করে এখানে এলেন—' বলেই মাথা এবং হাতের ইশারায় বয়টাকে কফি টফি আনতে পাঠিয়ে দিল। তারপর টেবলের ওপর দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে বলল, 'বহেনজি আমি বহুত তাজ্জব বনে গেছি।'

জয়া স্থির চোখে ধরতীপ্রসাদকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'কেন বলুন ত?'

'আপনাদের মতো বড় ফ্যামিলির মেয়েরা কখনো এই হোটেলে পা দ্যায় না। এর অনেক বদনাম আছে—শোনেন নি? তাই ওপরে ডাকিয়ে এনেছি।'

তক্ষুণি উত্তর দিল না জয়া। ধরতীপ্রসাদের মুখ থেকে সে চোখ সরায় নি। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা আপনার হোটেলে খেতে আসি নি ধরতীপ্রসাদজি।'

'তবে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

হাত গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল ধরতীপ্রসাদ। বলল, 'আমার সঙ্গে? কেন বলুন ত?'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই কফি এবং কাটলেট এসে গেল। কফিতে

আলতো চুমুক দিয়ে জয়া বলল, 'একটা বিশেষ দরকারে।' একটু থেমে ফের বলল, 'আমার বাবা খুন হয়েছেন, নিশ্চয়ই জানেন।'

ধরতীপ্রসাদের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া পড়ল। ভারী গলায় বলল, 'নকীপুরের কে না জানে—'

'আমরা সেই সব ব্যাপারেই এসেছি।' এখানে আসার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে জানিয়ে জয়া বলল, 'আপনার সাহায্য ছাড়া খুনীদের ধরা যাবে না।'

ধরতীপ্রসাদ হকচকিয়ে গেল। দ্রুত হোটেলের দিকটা এবং রেস্তোরাঁর ভেতরটা দেখে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'কে বললে আমি সাহায্য করলে খুনীরা ধরা পড়বে?'

'মুঙ্গিলাল।'

'কোন মুঙ্গিলাল? যে অটো চালায়?'

'হ্যাঁ। সম্পর্কে আপনার ভাই হয় ত?'

'হয়। লেকেন—'

'কী?'

অবরুদ্ধ গলায় ধরতীপ্রসাদ বলল, 'দেখুন খুনের ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছু জানি না। কতটুকু সাহায্য করতে পারব, বুঝতে পারছি না।'

বিকাশ বলল, 'যতটুকু জানেন ততটুকুই বলবেন। তবে আপনার এই হোটেলে বসে এ সব কথাবার্তা না হওয়াই ভাল। অন্য কোথাও যদি ঘণ্টাখানেক আমরা বসতে পারতাম—'

ধরতীপ্রসাদ তক্ষুণি সায় দিল। হোটেলে খুনের বিষয়ে আলোচনা ঠিক না। কত ধরনের মানুষ আসে এখানে। কে কী শুনে ফেলবে! একটু চিন্তা করে সে বলল, 'আজ রাত আটটায় গোল পার্কে আসতে পারবেন?'

নকীপুর মিউনিসিপ্যালিটি বছরখানেক আগে শহরের মাঝখানে বিশাল একটা পার্ক বানিয়েছে। পার্কটা গোলাকার বলে তার নামকরণ ওইরকম। বিকাশ বলল, 'নিশ্চয়ই পারব।'

ধরতীপ্রসাদ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাচের দরজা ঠেলে একটা ভারী মাংসল চেহারার ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা লোক ঘরে ঢুকল। প্রকাণ্ড মুখ তার, হাঁসের মুখ ডিমের মতো ছুটো চোখ রোমশ জোড়া ভুরুর তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। থুতনি বা গলা বলতে তার বিশেষ কিছুই নেই, মাথাটা সরাসরি বিশাল ধড়ের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাথার চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে লক্ষ্ণৌ-এর কাজ-করা কালদার পাঞ্জাবি এবং চুস্ত, পায়ে শুঁড়-তোলা নাগরা। বাঁ-হাতের কব্জিতে রিস্টওয়াচের চওড়া স্টীল ব্যাণ্ড চামড়ার ওপর চেপে বসেছে। ডান হাতে স্টীলেরই চকচকে বালা। আঙুলে অনেকগুলো আংটি। গলায় সোনার সরু চেন, সেটার লকেট হল মীনে-করা একটা ছোট্ট ছুরি।

লোকটাকে দেখামাত্র ধরতীপ্রসাদের মধ্যে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে খুবই খাতির টাতির করে বলল, 'নমস্তে মনসুখজী, নমস্তে—' ধরতীপ্রসাদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, এই মুহূর্তে সে ওই লোকটার অর্থাৎ মনসুখের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

মনসুখকে কিন্তু আদৌ উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেল না। সংক্ষেপে 'নমস্তে' বলে চোখের কোণ দিয়ে বিকাশ এবং জয়াকে সে দেখতে লাগল।

জয়ারা লক্ষ্য করল, মনসুখের চোখে কিসের যেন ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল।

ধরতীপ্রসাদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, 'বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে—'

আবেগহীন গলায় মনসুখ বলল, 'আরে বাবা, আমাকে অত খাতিরদারি করতে হবে না। আমি ছোটামোটা আদমী—' বলে একটা চেয়ার টেনে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বসে পড়ল। তবে তার চোখ ঘুরে ফিরে বিকাশদের দিকেই চলে আসছে।

এদিকে জয়ার স্নায়ুগুলো চকিত হয়ে উঠেছে, তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কী যেন অনবরত ছোটাছুটি করতে

লাগল। মহীতোষ মৃত্যুর আগে তাকে একদিন বলেছিলেন, যে লোকটা সাক্ষি না দেবার জন্য প্রায়ই তাঁকে ফোনে শাসাত বা অনুরোধ করত সে প্রতিটি কথার ফাঁকে একবার করে 'ছোটামোটা আদমী' এই শব্দ দুটো জুড়ে দিত। মহীতোষ এর কথা ডায়েরিতে লিখে গেছেন। তবে কোথাও তার নাম নেই। খুব সম্ভব তিনি নামটা জানতে পারেন নি।

মহীতোষ যেভাবে বলেছিলেন, হুবহু সেই চালেই কথা বলছে মনসুখ। তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কেননা যে কেউ বলার ঝোঁকে এক-আধবার 'ছোটামোটা আদমী' বলতে পারে। কিছুক্ষণ কথা শুনলে বোঝা যাবে, মনসুখই মহীতোষকে ফোন করত কিনা।

ধরতীপ্রসাদ তটস্থ হয়েই ছিল। বলল, 'কী আনাবো—চা না কফি?'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল মনসুখ।

'তা হলে ঠাণ্ডা কিছু আনাই?'

'না না, কিচ্ছু লাগবে না। আমার মতো ছোটামোটা আদমীকে এত খাতিরদারি করলে বড় শরম লাগে।'

ধরতীপ্রসাদ এবার বলল, 'তব্ ফরমাইয়ে আপকো লিয়ে কিয়া কর সাকে?'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মনসুখ বলল, 'আমার ওখানে আজ রাত্তিরে ক'জন মেহমান আসবে। তাদের ভাল করে খাওয়াতে হবে। কী খাওয়ালে আমার মন-ইজ্জত থাকে, সেই মেনুটা আপনি ঠিক করে দেবেন।'

ধরতীপ্রসাদ যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। বলে, 'হাঁ হাঁ, জরুর। এক্ষুণি করে দিচ্ছি। আপনার মেহমান কতজন?'

'আমার মতো ছোটামোটা আদমীর মেহমান আর কত হতে পারে! হোগা চাল্লিশ একতাল্লিশ।'

মনসুখই যে মহীতোষকে ফোন করত, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না জয়ার। মুখ না ফিরিয়েও সে টের পায়, বিকাশও মনসুখের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এবং পকেটে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে তার

কথা ধরে রাখছে। লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছে বলে জয়া মনে করতে পারল না। একবার দেখলে সে কিছু ভোলে না।

ধরতীপ্রসাদ মনসুখকে বলল, 'আমি এক্ষুণি মেনু ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি শুধু অ্যাপ্রুভ করে টাইম বলে দিয়ে যান। খাবার ঠিক সময়ে আপনার অ্যাড্রেসে পৌঁছে যাবে।'

মনসুখ বলল, 'আমার ব্যাপারটা পরে হবে। আপনি এঁদের দেখুন। এঁরা আগে এসেছেন।' বলে থুতনি তুলে জয়াদের দেখিয়ে দিল।

মনসুখকে নিয়ে ধরতীপ্রসাদ এতই ব্যতিব্যস্ত যে জয়াদের কথা যেন একেবারে ভুলে গেছে। চমকে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে তাড়াতাড়ি একটা প্যাড আর ডট-পেন বার করল। তারপর তড়বড় করে বলল, 'হ্যাঁ, আপনাদের অর্ডারটা তা হলে টুকে নিই। একশো চপ, দো শো কাটলেট—'

জয়া এবং বিকাশ প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই বুঝতে পারল, ধরতীপ্রসাদ মনসুখকে বুঝতে দিতে চায় না, কী উদ্দেশ্যে তারা 'নবরং হোটেলে' এসেছে।

ধরতীপ্রসাদ একরকম তাড়াই দিতে লাগল জয়াদের, 'বলুন বলুন—আর কী অর্ডার লিখব?'

বিকাশ বলল, 'চপ কাটলেটের সঙ্গে কিছু মাটন রোলও দেবেন।'

'কত পীস?'

একটু চিন্তা করে বিকাশ বলল, 'দেড়শো পীস হলেই চলে যাবে।'

লিখতে লিখতে ধরতীপ্রসাদ বলল, 'খাবারগুলো কবে চাই আপনাদের?'

'পরশু বিকেলে, পাঁচটা নাগাদ।'

'ডেলিভারি কিভাবে হবে? মাল আমরা পাঠাব, না আপনারা নেবার ব্যবস্থা করবেন?'

'আমরা লোক পাঠিয়ে দেব।'

চপ-কাটলেটের অর্ডার দেওয়া ছাড়া এখানে আসার আর কোন গূঢ় অভিসন্ধিই যে জয়াদের নেই, সেটা মনসুখকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে ধরতীপ্রসাদ বিকাশকে বলল, 'ধন্যবাদ। নমস্তে—'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। এবার জয়াদের যেতে হবে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দু'জনেই বলল, 'নমস্কার।'

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে মনসুখের গলা কানে এল জয়াদের। সে ধরতীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করছে, 'এরা কারা আপনি জানেন?'

প্রশ্নটা যে তাদেরই সম্পর্কে, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না জয়াদের। ধরতীপ্রসাদের উত্তরটাও তৎক্ষণাৎ শোনা গেল। হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে শশব্যস্তে বলে উঠল, 'নেহী নেহী। কভি নেহী দেখা।'

এরপর ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা হল, জানা গেল না। কেননা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতা ত আর সম্ভব নয়।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা অটো ধরে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে জয়া বলল, নবরং হোটেলে এসে একটা দারুণ খবর পাওয়া গেল।' তার গলায় রীতিমত উত্তেজনা।

বিকাশও ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়েই ছিল। বলল, 'দ্যাট ম্যান—ওকেই আমাদের টার্গেট করতে হবে।'

দ্যাট ম্যানটা যে কে, জয়া তক্ষুণি বুঝতে পারে। বলে, 'নিশ্চয়ই। এই মার্ডারের মধ্যে ওর একটা বড় রোল আছে। ওর কাছ থেকে কনফেসান আদায় করতে পারলে আসল কালপ্রিটদের ধরা যাবে।'

'যেভাবেই হোক এই কনফেসানটা আদায় করতে হবে।'

'কী ভাবে?'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল বিকাশ। তারপর বলল, 'এক্ষুণি কিছু ভাবতে পারছি না। রাত্তিরে অনুপের ফোন আসবে। ওর সঙ্গে আলোচনা করে দেখা যাক, কী সাজেস্ট করে।'

জয়া বলল, 'তার আগে আটটায় গোল পার্কে ধরতীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হবে। ওই লোকটার ভয়ে সে তখন কিছুই বলতে পারে নি। কাল নিশ্চয়ই মুখ খুলবে। আশা করি ওর কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে। তারপর যা করলে কাজ হবে তাই করব।'

বার

জয়ারা যখন বাড়ি পৌছুল, ছ'টা বাজে। অটোতে আসতে আসতে দু'জনে ঠিক করে নিয়েছে, সোয়া সাতটায় আবার বেরিয়ে পড়বে। বাড়ি থেকে গোল পার্ক পৌছুতে মিনিট কুড়ি পঁচিশ লাগে। পৌনে আটটার মধ্যে তারা ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করবে। ধরতীপ্রসাদ কোন কারণে দু-পাঁচ মিনিট আগে এসে তাদের না পেয়ে ফিরে যাবে—সেটা কোনভাবেই হতে দেওয়া যায় না।

মহীতোষের পড়ার ঘরে স্নায়ু টান টান করে বসে রইল জয়ারা। আর মাঝে মাঝেই টেপ বাজিয়ে মনসুখের গলার স্বর শুনতে লাগল।

সাতটা যখন বাজে, আচমকা ফোন বেজে উঠল। জয়াই উঠে গিয়ে সেটা তুলে নিল, 'হ্যালো—'

ওধার থেকে ধরতীপ্রসাদের গলা ভেসে এল, 'কে, জয়া বহেন কথা বলছেন?'

লোকটার কণ্ঠস্বর চাপা এবং ভয়ানক কাঁপছে। জয়া যতটা অবাক হল, তার চেয়ে অনেক বেশি ভীত। বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করলে সে। যার সঙ্গে এক ঘন্টা বাদে দেখা হবার কথা, হঠাৎ সে ফোন করল কেন? জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

ধরতীপ্রসাদ বলল, 'প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

'কিসের জন্যে ক্ষমা?'

'বিকেলে আমার ঘরে বসে কথা বলতে বলতে আচানক এমন ভাব করেছিলাম যেন আপনাদের চিনি না, আপনারা যেন আমার কাছে খাবারের অর্ডার দিতে এসেছেন।'

জয়া বলল, 'সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। ওই লোকটা আসার পরই আপনি হঠাৎ একেবারে বদলে গেলেন।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। মনসুখের কথা বলতেই ভয় পেয়ে লাইন কেটে দিল নাকি লোকটা? মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর জয়া বলল, 'ধরতীপ্রসাদজি—'

ধরতীপ্রসাদের সাড়া পাওয়া গেল, 'বলুন বহেনজি।'

'আমি তো ভাবলাম, আপনি লাইন ছেড়ে দিয়েছেন।'

'নেহী।'

মনসুখের প্রসঙ্গ না তুলে জয়া বলল, 'আপনার সঙ্গে আটটায় গোল পার্কে দেখা হবার কথা। এখন ফোন করলেন? কিছু দরকার আছে?'

'হাঁ, বহেনজি।' বলে একটু থামল ধরতীপ্রসাদ। পরক্ষণেই আবার তার গলা ভেসে এল, 'আপনার কাছে আরো একবার ক্ষমা চাইতে হচ্ছে। সেই জন্যেই ফোনটা করেছি।'

'আবার ক্ষমা চাইবেন কেন?' রীতিমত অবাকই হল জয়া।

'আপনাদের সঙ্গে আজ গোল পার্কে দেখা করতে পারব না।' ধরতীপ্রসাদ বলল। তার কণ্ঠস্বরে অসীম কুণ্ঠা।

জয়া চমকে উঠল, 'কেন বলুন ত?'

'আমার একটু অসুবিধা আছে।'

'তা হলে কাল দেখা করি।'

'না বহেনজি।'

'কবে দেখা করলে আপনার অসুবিধে হবে না?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ধরতীপ্রসাদ বলল, 'আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভালো।'

জয়া হকচকিয়ে গেল। বলল, 'মানে?'

'দয়া করে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না বহেনজি।'

'আপনি কি চান না আমার বাবার খুনীরা ধরা পড়ুক?'

'নিশ্চয়ই চাই, নিশ্চয়ই চাই।' ধরতীপ্রসাদ বলতে লাগল, 'লেকেন আমিও নিজে বাঁচতে চাই।'

'আমি ত কথাই দিয়েছি, আপনি যা বলবেন গোপন থাকবে।'

'আমার মনে আছে। লেকেন আপনারা চলে যাবার পর একটা ফোন আসে। তাতে শাসিয়েছে, চৌধুরীজির খুন সম্পর্কে মুখ খুললে আমাকে খতম করে ফেলবে।' কাঁপা ভয়ার্ত গলায় ধরতীপ্রসাদ বলতে থাকে, 'তা ছাড়া, ওই ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছু জানিও না। আচ্ছা বহেনজি, নমস্তে—'

অর্থাৎ ধরতীপ্রসাদ ফোন নামিয়ে রাখতে চাইছে। জয়া ভীষণ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'ছাড়বেন না। একটু ধরে থাকুন—'

'আচ্ছা।'

প্রাণের ভয়ে যে সন্ত্রস্ত, তার কাছ থেকে মহীতোষের হত্যা সম্পর্কে কোন জরুরী ক্লু বার করা আদৌ সম্ভব না। টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে জয়া বিকাশের দিকে তাকাল। বিকাশ উদ্বিগ্নভাবে ধরতীপ্রসাদের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনছিল। সে জয়ার কথাই শুনেছে কিন্তু টেলিফোনের অদৃশ্য প্রান্ত থেকে ধরতীপ্রসাদ কী বলেছে সেটা জানা তার পক্ষে সম্ভব না। তবে জয়া যা প্রশ্ন করেছিল বা উত্তর দিচ্ছিল তা থেকে ধরতীপ্রসাদ কী বলতে পারে তার মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারছিল। ধরতীপ্রসাদ কী বলেছে, খুব সংক্ষেপে বিকাশকে জানিয়ে জয়া জিজ্ঞেস করল, এখন সে কী করবে?

বিকাশ সামান্য চিন্তা করে বলল, 'তুমি শুধু মনসুখের ঠিকানাটা নিয়ে নাও।'

রিসিভারের মুখ থেকে হাত সরিয়ে জয়া বলল, 'আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। শুধু একটা জিনিস চাইব।'

'কী?' ধরতীপ্রসাদের কণ্ঠস্বরে সতর্কতা এবং ভয় ফুটে উঠল।

জয়া মনসুখের ঠিকানার কথা বলল।

টেলিফোনেও টের পাওয়া গেল ধরতীপ্রসাদ আঁতকে উঠেছে, 'মনসুখের ঠিকানা আমি জানি না।'

'জানেন ধরতীপ্রসাদজি, নিশ্চয়ই জানেন। বিকেলে বলছিলেন না,

ওর মেহমানদের জন্যে নিজের পছন্দমতো খাবার করে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা না জানলে পাঠাবেন কী করে?'

জয়ার এমন প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তির জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ধরতীপ্রসাদ। বেশ কিছুক্ষণ তার গলায় আওয়াজ ফুটল না। পরে খানিকটা সামলে নিয়েই যেন বলল, 'মনসুখজির ঠিকানার সঙ্গে চৌধুরীজির খুনের সম্পর্ক নেই।'

'আছে যে তা ত বলি নি। ওর ঠিকানাটা আমার একটু দরকার।'

খুব সম্ভব কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিত হয়ে রইল ধরতীপ্রসাদ। তারপর নিজের অজান্তেই যা বলল তা এইরকম। মনসুখ অন্য টাইপের মানুষ। জয়ার মতো রেসপেক্টবল ফ্যামিলির মেয়ের পক্ষে তার ঠিকানা চাওয়া ঠিক নয়।

কিন্তু জয়া একরকম জেদই ধরল, মনসুখের ঠিকানা তার চাই-ই।

শেষ পর্যন্ত যেন নিরুপায় হয়েই ধরতীপ্রসাদকে বলতে হল, 'গ্রীন মার্কেটের পেছনে যে মহল্লা আছে সেখানে চার নম্বর কোঠিতে থাকে। লেকেন বহেনজি—'

'কী?'

'গ্রীন মার্কেট জায়গাটা বহুত বুরা। আর—'

গ্রীন মার্কেটের পেছন দিকটা যে এ শহরের অত্যন্ত কুখ্যাত এলাকা, নকীপুরের সবাই তা জানে। রেড লাইট এরীয়া অর্থাৎ রেণ্ডি-টুলিটা ওখানেই। আর থাকে মারাত্মক সব গুণ্ডা, বেশ্যার দালাল, মাতাল, ইত্যাদি ইত্যাদি। জয়া জিজ্ঞেস করল, 'আর কী?'

ধরতীপ্রসাদ বলল, 'কভি উধর কদম মাত বঢ়াইয়ে বহেনজি, কক্ষণো ওদিকে যাবেন না।'

ঠিকানাটা দিয়েছে ঠিকই, তবু জয়া যাতে কোনভাবেই মনসুখের কাছাকাছি ঘেঁষতে না পারে, সে জন্য বার বার প্রায় মরিয়া হয়েই ধরতীপ্রসাদ গ্রীন পার্ক এরীয়ার একটা ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছে। সে চায় না, জয়ার সঙ্গে মনসুখের যোগাযোগ ঘটুক। জয়া বলল, 'না না,

যাব না।'

ধরতীপ্রসাদ এবার জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব বহেনজি ?'

'করুন না।'

'মনসুখের ঠিকানা নিলেন কেন ?'

'ধরুন এমনিই—ইচ্ছে হল।'

ধরতীপ্রসাদ আর কোন প্রশ্ন করল না এ বিষয়ে। শুধু ক্লান্তভাবে বলল, 'আমার কাছ থেকে যে ঠিকানাটা পেয়েছেন, কেউ যেন না জানতে পারে।'

জয়া বলল, 'আপনাকে ও আগেই কথা দিয়েছি, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'নমস্তে।'

'নমস্কার।'

ধরতীপ্রসাদ লাইন কেটে দিল

কাটায় কাঁটায় ন'টা বাজলে রামপুর থেকে অনুপের ফোন এল। এবার ফোন ধরল বিকাশ। রামপুরে গিয়ে আজই চার্জ বুঝে নিয়েছে সে, এই কারণে সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তাকে—এ জাতীয় দু একটা কথার পর বলল, 'রামপুরে এলেও আমার মন পড়ে আছে ওখানেই। আপনাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে সারাক্ষণ ছটফট করছি। এবার বলুন, নকীপুরের খবর কী ? হোল ডে কী করলেন ?' এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল অনুপ।

বিকাশ বলল, 'আজ আমরা দু'জনের সঙ্গে দেখা করেছি—অটো-রিকশাওলা মুঙ্গিলাল আর নবরং হোটেলের ম্যানেজার ধরতীপ্রসাদ।'

'তাদের সঙ্গে কী কথা হল, বলুন। ডিটেলে বলবেন। কিছু বাদ দেবেন না।'

মুঙ্গিলাল এবং ধরতীপ্রসাদের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, সব বলল

বিকাশ। তারপর মনসুখের প্রসঙ্গ উঠতেই অনুপ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনারা নিজের কানে ওকে 'ছোটামোটা আদমী' বলতে শুনেছেন?'

বিকাশ বলল, 'নিশ্চয়ই। ওর ভয়েস টেপও করে রেখেছি, ঠিকানাও যোগাড় করেছি। ধরতীপ্রসাদের হাবভাব দেখে মনে হল লোকটা নোটোরিয়াস গুণ্ডা। থাকেও খুব খারাপ জায়গায়, গ্রীন মার্কেটের পেছন দিকের জঘন্য পাড়ায়।'

'গোয়েন্দাগিরিতে নেমে আপনারা একদিনেই কামাল করে দিয়েছেন।' অনুপের গলার স্বর শুনে টের পাওয়া গেল সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, 'আপনারা যে হঠাৎ ছোটামোটা আদমীর দেখা পেয়ে গেছেন তাতে কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হতে চলেছে জানেন? চৌধুরীজির খুনের আসল পাণ্ডাদের এবার ধরা যাবে। অবশ্য—'

'কী?'

'শেষ পর্যন্ত তাদের ফাঁসিতে ঝোলাতে পারব কিনা জানি না। তবে আমি সহজে ছাড়ছি না।'

'মনসুখ সম্পর্কে আমাদের আর কী করতে হবে, বলে দিন। গ্রীন মার্কেটের পেছনে গিয়ে আরো খোঁজখবর নেব?'

'না। এখন যা করার শর্মাই করবে। আমি ওকে বলে দেব। আপনারা একেবারেই ওধারে যাবেন না।'

একটু ভেবে বিকাশ এবার বলল, 'মুঙ্গিলাল আর ধরতীপ্রসাদ ভয়ে ভয়ে আছে, বিশেষ করে ধরতীপ্রসাদ। সে যে মনসুখের ঠিকানা দিয়েছে, এটা জানাজানি হলে নাকি তার মারাত্মক বিপদ হতে পারে। এদের দু'জনের প্রোটেকসানের ব্যাপারে কিছু করা দরকার।'

'ঠিকই বলেছেন। আমি শর্মাকে জানিয়ে দেব, সে সব ব্যবস্থা করবে।' অনুপ বলতে লাগল, 'আপনারাও হুঁশিয়ার হয়ে চলাফেরা করবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'পলিটিক্যাল পার্টির লোকেরা আপনাদের সঙ্গে আর দেখা

করেছিল ?'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সকালের ব্যাপারটা। বেশ ব্যস্তভাবেই বিকাশ বলল, 'সকালে রামনেহাল আর হরকিষণ দু'জনে এসেছিলেন।'

অনুপ জিজ্ঞেস করল, 'ধান্দাটা কী ?'

কী উদ্দেশ্যে দুই রাজনৈতিক দলের নেতা জয়ার কাছে এসেছিলেন, বিকাশ জানালো।

অনুপ বলল, 'চৌধুরীজির মেয়ে কার সঙ্গে মুভমেণ্টে নামছেন—রামনেহাল না হরকিষণের ?'

'কোন দলের সঙ্গেই না।'

'ভেরি গুড। ওঁরা ওঁদের মতো ডি এম-এর বাংলো ঘেরাও করে বা সিগনেচার ক্যামপেন করে যত পারে গভর্নমেণ্টের ওপর প্রেসার দিক। আমরা আমাদের মতো করে মার্ডারের ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করি।'

বিকাশ উত্তর দিল না।

অনুপ আবার বলল, 'নিউজপেপারের লোকেরা আর এসেছিল ?'

বিকাশ বলল, 'না।'

'ফোন টোনও করে নি ?'

'না।'

'আপনারা এক কাজ করবেন। কাল একবার 'নকীপুর সমাচার' অফিসে গিয়ে সোজাসুজি চতুরলালজির সঙ্গে দেখা করবেন। জয়াজি বলবেন, ইণ্টারভিউ দিতে চান। যদি ইণ্টারভিউ নিতে চতুরলালজি রাজি হন, জয়াজি মার্ডারের দিন যা যা ঘটতে দেখেছেন যেন বলেন। মনসুখ মুঙ্গিলাল বা জয়াজির বাবার ডায়েরির কথা কোনভাবেই যেন না জানান। মনে থাকবে ?'

'থাকবে। কিন্তু যদি ইণ্টারভিউ নিতে না চান ?'

'তার সম্ভাবনাই নাইনটি নাইন পারসেণ্ট। তখন জিজ্ঞেস করবেন কেন নিতে চাইছেন না, না নেবার জন্যে কারা প্রেসার দিচ্ছে, এই সব। সব রি-অ্যাকসান টেপে রেকর্ড করে রাখবেন।'

'ঠিক আছে।'

'শুধু 'নকীপুর সমাচারে'ই না, যে সব নিউজ উইকলি টুইকলি আছে তাদের অফিসেও যাবেন। আমার ধারণা, সব জায়গায় আপনাদের একই রকম এক্সপিরিয়েন্স হবে।'

'নিশ্চয়ই যাব।' বলে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু করতে হবে?'

অনুপ বলল, 'একদিনে সব পারবেন না। কাল জানিয়ে দেব।'

'না, আজই বলুন। দরকার হলে কালও আমি ছুটি নেব।'

ধীর গলায় অনুপ বলল, 'তাড়াহুড়ো করবেন না। মনে রাখবেন একটা বিরাট অর্গানাইজড এবং ডেঞ্জারাস গ্রুপের বিরুদ্ধে আপনারা লড়াই করছেন। ছোটখাটো একটা ভুল করে ফেললে প্রাণ চলে যাবে। চোখকান খোলা রেখে প্রতিটি স্টেপ সাবধানে ফেলতে হবে। বী কেয়ারফুল।'

যখনই কথা হয়, অনুপ তাদের সতর্ক করে দেয়। বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেয়ারফুল তো থাকতেই হবে। তবু জেনে রাখি, দু-একদিনের ভেতর আর কী কী করতে হবে।'

অনুপ বলল, 'আমার নোটে আর চৌধুরীজির ডায়েরিতে একটা লোকের নাম তিন বার আছে। নামটা মোটা করে আণ্ডারলাইন করে দিয়েছি। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ—ধনপত ঠাকুর। রেল স্টেশনের কাছে তার একটা ছোট পানের দোকান আছে।'

বিকাশের মনে পড়ল, ধনপতের কথা এভাবে ডায়েরিতে লিখে গেছেন মহীতোষ। তাঁর এবং আরো দু'জনের মতো ধনপতও ভানুপ্রতাপ সহায়কে খুন হতে দেখেছে। সে অবশ্য আদালতে সাক্ষি দিতে চায়নি। না চাইলেও রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে কথাটা মহীতোষকে জানিয়ে গেছে। বলেছে, ভানুপ্রতাপজির মতো একজন ভালোমানুষকে যেভাবে খুন করা হয়েছে তাতে সে খুবই বিচলিত। কিন্তু খুনীদের ভয়ে সে

কোর্টে যেতে পারছে না। মহীতোষ তার কাছে মা-বাপ। তিনি যদি হুকুম দেন, অবশ্যই জজ সাহেবের সামনে গিয়ে খুনীদের নাম-ধাম জানিয়ে আসবে। কারা এই খুনের সঙ্গে যুক্ত সে ভাল করেই জানে।

মহীতোষ ধনপতকে এ বিষয়ে মুখ খুলতে বারণ করেছেন। সে গরীব মানুষ। সাক্ষি দিতে গেলে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। আপাতত যা করার মহীতোষই করবেন। পরে খুব দরকার হলে দেখা যাবে, ধনপতকে প্রয়োজন হয় কিনা।

অনুপ বলল, 'এই ধনপত লোকটা ভানুপ্রতাপজি আর চৌধুরীজির মার্ডার কেসে ভেরি ভেরি ইমপর্টান্ট পারসন। চৌধুরীজির ডায়েরিতে আছে, ভানুপ্রতাপজির মার্ডারারদের পেছনে কারা আছে, ধনপত তাদের চেনে। অবশ্য তাদের নাম চৌধুরীজি লিখে যান নি। আমি আগেও বলেছি ভানুপ্রতাপজিকে যে গ্যাংটা খুন করেছে তারাই চৌধুরীজিরও মার্ডারার।'

'হ্যাঁ, বলেছেন।'

'আমি ধনপতের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে পারি নি। সে তখন মতিহারিতে গিয়েছিল। তারপর ত ট্রান্সফারই হয়ে গেলাম। ধনপতের কাছে ভ্যালুয়েবল ক্লু আছে। যেভাবে হোক, সেটা বার করা চাই। তবে বী—'

অনুপের কথা শেষ হবার আগে বিকাশ হাসতে হসেতে বলল, 'বী কেয়ারফুল, এই ত?'

ওধার থেকে অনুপের হাসির শব্দ ভেসে এল। সে বলল, 'আচ্ছা, আজ রাখছি।'

তের

কাল রাতেই অনুপের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর বিকাশ ঠিক করে ফেলেছিল আজ আর অফিসে যাবে না। প্রচুর ক্যাজুয়াল লীভ পাওনা আছে। ছুটির ব্যাপারে অসুবিধা নেই। দুপুরে একসময় ফোন করে অফিসে জানিয়ে দিলেই হবে।

অন্য দিনের মতো আজও সকালে একবার জয়াদের বাড়ি এল বিকাশ। জয়ার সঙ্গে সারাদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে নিতে হবে। আজ তাদের নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি আছে, অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

জয়ার সঙ্গে আলোচনা করে প্রোগ্রামটা এভাবে করা হল। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর প্রথমে তারা যাবে 'নকীপুর সমাচার' অফিসে। চতুরলালের সঙ্গে কথা বলে তারা পর পর যত নিউজ উইকলি বা ফোর্টনাইটলি আছে—সব অফিসে যাবে। এমন কি, কলকাতা পাটনা দিল্লী বম্বের বড় বড় পত্রিকার যে সব করেসপনডেন্ট নকীপুরে আছে, তাদের সঙ্গেও দেখা করবে। তারপর সন্ধ্যেবেলা যাবে রেল স্টেশনের পাশে ধনপত ঠাকুরের পানের দোকানে।

ওদের আলোচনার মধ্যেই দু'বার জয়ার ফোন এল। প্রথমটা রামনেহালের :

'বহেনজি, কাল সকাল থেকে আমরা ডি এম-এর বাংলো ঘেরাও করব, ঠিক করেছি।' রামনেহাল বললেন।

জয়া বলল, 'জানি। সেদিন বলেছিলেন।'

'আমাদের আর্জিটার কী হল? আপনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন ত?'

'ক্ষমা করবেন, আমি রাজনীতির বাইরের মানুষ। এ ব্যাপারে থাকতে পারব না।'

'আমাদের পার্টি থেকে ঘেরাও অর্গানাইজ করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। আমরা চাই, চৌধুরীজির খুনীরা ধরা পড়ুক। আপনিও নিশ্চয়ই চান?'

'নিশ্চয়ই চাই। সেদিনই আমাকে বলেছিলেন।'

'আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের মুভমেন্টটা জোরালো হয়।'

'ক্ষমা করবেন। আমি এ-ব্যাপারে কিছুতেই থাকতে পারব না।'

একটু চুপ করে রইলেন রামনেহাল। তারপর বললেন, 'রোজ যদি না থাকতে পারেন, অন্তত প্রথম দিনটা ঘেরাও শুরু হবার সময় ঘণ্টা খানেক থাকলে ভাল হয়। এতে আমরা খুব উৎসাহ পাব।'

জয়া আবার বলল, 'ক্ষমা করবেন রামনেহালজি—'তার কণ্ঠস্বরে রীতিমত দৃঢ়তা।

এর আধ ঘণ্টা পর হরকিষণের ফোন এল। তাঁরও একই আর্জি। আজ দুপুর থেকে তাঁরাও গণস্বাক্ষর আদায়ের অভিযান শুরু করতে চান। এই অভিযানে জয়ার না থাকলেই নয়। রোজ থাকতে না পারলেও অন্তত সে যেন কিছুক্ষণ থেকে অভিযানের উদ্বোধনটা করে দেয়। তার উপস্থিতি এই অভিযানে যথেষ্ট শক্তি যোগাবে।

জয়া হরকিষণের কাছেও ক্ষমা চাইল। রাজনৈতিক দলের কোন আন্দোলন অভিযান বা উদ্যোগেই সে থাকতে পারবে না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বারোটা নাগাদ একটা অটো-রিকশা ধরে শহরের ঠিক মাঝখানে 'নকীপুর সমাচারে'র অফিসে চলে এল জয়া আর বিকাশ।

'নকীপুর সমাচারে'র বিশাল তেতলা বাড়িটা একেবারে নতুন এবং ঝকঝকে। সেটার দরজা-জানলা এবং দেয়াল থেকে টাটকা পেইন্ট এবং চুনের গন্ধ উঠে আসছে।

আগে 'নকীপুর সমাচার' বেরুতো রেল লাইনের ওধারে ফুটিফাটা টিনের চালের একটা লম্বা মতো শেডের তলা থেকে। ওখানেই ছিল

তাদের প্রেস এবং অফিস। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড পুরানো প্রেসে ভাঙাচোরা টাইপে ছেপে তের চোদ্দ বছর 'নকীপুর সমাচার' চালিয়েছেন চতুরলাল দ্বিবেদী। আগে টিমটিম করে চলত। মাসের শেষে এমপ্লয়ীদের মাইনে দিতে জিভ বেরিয়ে যেত। তারপর এই শহর দ্রুত বদলেছে, 'নকীপুর সমাচারে'র হালও পাল্টাতে শুরু করেছে। এখানে ইণ্ডাস্ট্রি বেড়েছে অজস্র কিন্তু দৈনিক কাগজ ত একটাই। কাজেই অঢেল বিজ্ঞাপন আসতে লাগল, সেই সঙ্গে অজস্র টাকা। সার্কুলেসানও বাড়তে লাগল হু হু করে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমপ্লয়ীদের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে চলল। ফলে পুরনো ছোট বাড়িতে আর কুলোচ্ছিল না। মাসদুয়েক হলো 'নকীপুর সমাচার' নতুন বাড়ি করে উঠে এসেছে।

নতুন অফিসের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি ছিলেন রাজ্যপাল। দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কেউ কেউ নকীপুরে ছুটে এসেছিলেন। তা ছাড়া ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, অধ্যাপক, বিগ বিজনেসম্যান, ইত্যাদি নানা ধরনের বিশিষ্ট মানুষজন এতে যোগ দিয়েছিলেন।

নতুন বাড়ির একতলায় প্রেস। দোতলা এবং তেতলায় অফিস তেতলার একধারে চতুরলাল সপরিবারে থাকেনও।

অটোওলার ভাড়া চুকিয়ে দু'জনে অফিস বিল্ডিংটার ভেতরে চলে এল। আগেও কয়েক বার এখানে এসেছে বিকাশ। এ বাড়ির সব কিছুই তার জানা।

সোজা তেতলায় উঠে সম্পাদকের চেম্বারে ঢুকে পড়ল দু'জনে। বিকাশের সঙ্গে চতুরলালের যা সম্পর্ক তাতে দেখা করার জন্য আগে স্লিপ পাঠাতে হয় না। সোজা সে চেম্বারে ঢুকে যায়। চতুরলালের নিজস্ব বেয়ারা তা জানে।

চতুরলাল তাঁর চেম্বারেই আছেন। বিশাল গ্লাস-টপ টেবলের ওপর ঝুঁকে কিছু লিখছিলেন। পায়ের শব্দে চোখ তুলে প্রথমটা চমকে উঠলেন। বিকাশ এবং জয়াকে এই মুহূর্তে যেন আশা করেন নি।

কিন্তু এক পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন চতুরলাল। বললেন, 'কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন। বসুন—এই যে এখানে।'

জয়ারা বসলে তিনি ফের বসে পড়লেন। তারপর বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বলে আবেগভরা গলায় জানালেন, জয়া কোনদিন যে এখানে আসবে তিনি ভাবতেও পারেন নি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কফি হয়ত তৈরি করাই থাকে। এক মিনিটের ভেতর বেয়ারা তিনটি সুদৃশ্য কাপে কফি আর কিছু কাজু বাদাম এবং বিস্কুট দিয়ে গেল।

জয়া বলল, 'আপনার কাছে একটা খুব দরকারী কাজে এসেছি।'

চতুরলাল হাসলেন, 'তাড়াহুড়োর কী আছে। কফি টফি খেয়ে নিন। আমাদের নতুন অফিস বিল্ডিংটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই। তারপর কাজের ব্যাপারটা শোনা যাবে।'

এলোমেলো নানা ধরনের কথার মধ্যে কফি খাওয়া শেষ হল। তারপর এক তলার প্রেস থেকে শুরু করে দোতলা এবং তেতলায় অফিসের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার পর আবার সবাই সম্পাদকের চেম্বারে ফিরে এল।

জয়া বলল, 'এবার তা হলে কাজের কথাটা শুরু করা যাক।'

চতুরলাল আস্তে ঘাড় কাত করলেন, 'ঠিক আছে।'

জয়া এবার বলল, 'আমাদের বাড়িতে আপনি ত আর গেলেন না বা আমাকে ফোনও করলেন না!'

জয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে চতুরলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন ত?'

'বাঃ, এর মধ্যে ভুলে গেলেন!' রীতিমত অবাকই হল জয়া।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল চতুরলালের। লজ্জিত ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'ও হ্যাঁ, সেই ইন্টারভিউর জন্যে ত?'

'হ্যাঁ।' জয়া চতুরলালের চোখ থেকে চোখ সরাল না। বলতে

লাগল, 'আপনি গেলেন না। আমি নিজেই ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। বাবাকে যেদিন খুন করা হয়, আমি যা যা দেখেছি সব বলব।'

একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন চতুরলাল। খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর নড়েচড়ে বসে বললেন, 'কেন আপনাদের ওখানে আর যাই নি, এবার মনে পড়ছে। ভেবে দেখলাম, কেসটা সাব-জুডিস। এ বিষয়ে কিছু ছাপা ঠিক হবে না।'

জয়ার পাশ থেকে বিকাশ হঠাৎ বলে উঠল, 'এখনও খুনীরা ধরা পড়ে নি, কোর্টে কেস ওঠে নি, সাব-জুডিস হল কী করে?'

চতুরলাল যে ইচ্ছা করেই একটা চতুর চাল দিয়েছিলেন এবং তা ধরা পড়ে যাওয়ায় বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে। 'কেস সাব-জুডিস' এই অছিলায় যখন পার পাওয়া গেল না তখন বিব্রতভাবে বললেন, 'আরে তাই ত, খুনীরা এখনো ধরাই পড়ে নি। দেখুন কী বলতে কী বলে ফেলেছি! আসলে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করছে, এখন উল্টোপাল্টা কিছু বেরুলে ইনভেস্টিগেসনের ক্ষতি হয়ে যাবে।'

জয়া বলল, 'আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরকম।'

চতুরলাল সতর্ক চোখে তাকালেন, কিছু বললেন না।

জয়া থামে নি, 'ইন্টারভিউটা ছাপা হলে পুলিশের সুবিধেই হবে।'

চতুরলাল আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার মনে হয়, অসুবিধেই হবে বেশি। কেননা ইন্টারভিউটা শুধু পুলিশই পড়বে না, খুনীদের চোখেও পড়বে। তারা অ্যালার্ট হয়ে যাবে।'

ইন্টারভিউটা কেন ছাপা প্রয়োজন, নানাভাবে বোঝাতে চাইল বিকাশ এবং জয়া। এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে প্রশান্ত মুখে, অত্যন্ত বিনীত স্বরে চতুরলাল তার বিপক্ষে একটার পর একটা পাল্টা যুক্তি খাড়া করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত, বিরক্ত জয়া বলল, 'আপনি তা হলে ইন্টারভিউটা ছাপবেন না?'

'আপনাদের প্রোটেকসানের জন্যে।'

'মানে?'

'চৌধুরীজির খুনীদের ধরার জন্যে আপনারা যেভাবে ঘোরাঘুরি করছেন তাতে কারো কারো রাতের ঘুম ছুটে যাচ্ছে। তারা কি সহজে ছেড়ে দেবে?'

জয়া টের পেল তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কী যেন বয়ে গেল। ভীত কাঁপা গলায় বলল, 'আমাদের লাইফের ওপর অ্যাটেম্পট হতে পারে?'

'পারে বৈ কি। সেই জন্যেই প্রোটেকসানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

'আমাদের পেছনে যখন ফেউ লাগিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই জানেন কারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়। তারা কারা?'

'সেটা পুরোপুরি জানতে পারলে আর কোন সমস্যাই থাকত না; আমার কাজ জলের মতো সোজা হয়ে যেত।'

একটু চুপ।

তারপর জয়া জিজ্ঞেস করল, 'নিউজপেপারের লোকদের সঙ্গে দেখা করেছি। এবার আমাদের কী করতে হবে?'

অনুপ বলল, 'স াতদিন কিছু করার নেই। তারপর ধনপত ফিরে এলে দেখা করবেন।'

'আচ্ছা। কিন্তু—'

'কী?'

'একটা ব্যাপার আমার খটকা লাগছে।'

'কিসের খটকা?'

'বুঝতে পারছি রামপুরে ট্রান্সফার হলেও নকীপুরে আপনাদের যে সব নিজস্ব লোকজন আছে তাদের দিয়ে ইনভেস্টিগেসন চালাচ্ছেন; পুলিশে নিজের লোক থাকতে আমাদের কাজে লাগাচ্ছেন কেন?'

অনুপ বলল, 'এটা একটা ভাল প্রশ্ন। দেখুন এই মার্ডারের সঙ্গে

একটা ইমোশানাল ব্যাপার জড়িয়ে আছে। চৌধুরীজির মেয়ে যেখানে যেখানে গেলে বেশি কাজ হবে, শুধু সেই সব জায়গাতেই আপনাকে যেতে বলেছি।' বলতে বলতেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় অনুপের। গলার স্বর সামান্য চড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ভুনেশ্বর সিং আপনাদের সঙ্গে দেখা করেছিল?'

'ভুনেশ্বর সিং কে?'

'আমার জায়গায় যে এখন ইনভেস্টিগেসনের দায়িত্ব নিয়েছে।'

'না, আসে নি।'

'যাবে দু-একদিনের ভেতর। আচ্ছা, আজ ফোন রাখছি। কাল আবার কথা হবে।'

চোদ্দ

এরপর সাতটা দিন ঢিমে তালে কেটে গেল। অনুপের নির্দেশ অনুযায়ী জয়ারা কারো সঙ্গে দেখা টেখা করল না। জয়া বাড়ি থেকে না বেরুলেও বিকাশকে অবশ্য অফিসে যেতে হয়েছে। অকারণে ছুটি নিয়ে বসে থাকার মানে হয় না।

এর মধ্যে মহীতোষের মৃত্যু ঘিরে নকীপুরে চমকপ্রদ কিছুই ঘটে নি। হরকিষণের পাটির ছেলেরা যথারীতি রাস্তায় রাস্তায় লোকজন ধরে 'সিগনেচার ক্যামপেন' করে গেছে। তবে রামনেহালের পাটির ছেলেদের কাছে ঘেরাও-এর উৎসাহটা দু দিন বাদেই ঝিমিয়ে পড়েছে : এখন আর ডি এম-এর বাংলো ঘেরাও করা হচ্ছে না. তবে নিয়ম করে ওখানে গিয়ে ছেলেরা ঘণ্টাখানেক স্লোগান দিয়ে আসছে।

এই এক সপ্তাহে মোট দু'দিন ভুনেশ্বর সিং দলবল নিয়ে জয়াদের বাড়ি এসেছিল এবং মহীতোষের খুন সম্পর্কে খুব মামুলি ধরনের কিছু প্রশ্ন ট্রশ্ন করে চলে গেছে। অবশ্য মহল্লার আরো কয়েকটা বাড়িতে গিয়েও খোঁজখবর নিয়েছে তারা।

এর ভেতর রোজই রাত ন'টায় অনুপের ফোন এসেছে। রোজই জয়ারা বলেছে, এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে তাদের ভাল লাগছে না। আর কিছু করতে না দিক, অনুপ যেন মনসুখ সম্পর্কে আরো খোঁজখবর যোগাড় করতে দেয়। এতে অনুপ অখুশী হয়েছে। বেশ রূঢ়ভাবেই জানিয়েছে, ঝোঁকের মাথায় কোনরকম হঠকারিতা যেন না করে বসে জয়ারা। তাতে কেসটার ক্ষতি ত হবেই, জয়াদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। অনুপ বলেছে, 'আমি যেটুকু বলব, তার বাইরে কিছু করার দরকার নেই। শুধু ধনপত ফিরে এলে তার সঙ্গে কথা বলে নেবেন, যদি কিছু বার করা যায়।'

ঠিক এক সপ্তাহ বাদে বিকেলের দিকে স্টেশনে চলে এল জয়া। বিকাশও তার অফিস থেকে সোজা ওখানে এল। দু'জনে আজ এই সময় রেল স্টেশনে দেখা করবে, আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

ওরা আর দাঁড়াল না, সোজা ধনপতের পানের দোকানের সামনে এসে পড়ল।

আজ আর সেই ছোকরাটা বেচাকেনা করছিল না। তার জায়গায় চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের মেদহীন পাতলা চেহারার একটা লোক বসে আছে। গোল মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, পেছন দিকে এক গোছা মোটা টিকি। পরনে টকটকে লাল কামিজ আর মোটা সুতোর খাটো ধুতি। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় লোকটা সাদাসিধে, চোখদুটো ভারি সরল। আন্দাজ করা গেল, এই লোকটাই ধনপত।

দোকানে এই মুহূর্তে ভিড়টিড় নেই। মোট দু-তিনজন খদ্দের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পান সিগারেট কিনে তারা চলে যেতেই বিকাশ এগিয়ে গেল। বলল, 'ধনপত ঠাকুরের সঙ্গে আমরা দেখা করতে এসেছি।'

'আমি ধনপত ঠাকুর।' বলতে বলতেই সেই লোকটার অর্থাৎ ধনপতের চোখ এসে পড়ল জয়ার দিকে। কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে রইল সে। তারপর লাফ দিয়ে দোকানের উঁচু মাচা থেকে নিচে নেমে বলল, 'আপনি চৌধুরীজির লেড়কী না?'

জয়া ধনপতকে আগে না দেখলেও, দেখা যাচ্ছে, ধনপত তাকে ঠিকই চেনে। সে মাথাটা সামান্য কাত করে বলল, 'হ্যাঁ।'

ধনপত যে এবার জয়াকে নিয়ে কী করবে, কোথায় বসাবে, ভেবে পেল না। শুধু হাতজোড় করে বলতে লাগল, 'কী সৌভাগ্য, চৌধুরীজির লেড়কী আমার দুকানে এসেছেন!'

ধনপতের উচ্ছ্বাস খানিকটা কাটলে জয়া বলল, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি ধনপতজি।'

শশব্যস্তে ধনপত বলল, 'হাঁ হাঁ, কহিয়ে না—'

'এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। কোথাও একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসতে হবে।' জয়া বলতে লাগল, 'আধ ঘণ্টার বেশি আপনার সময় নেব না।'

'আধা ঘণ্টা কেন, দশ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা, এক রোজ, দো রোজ—যত রোজ বলবেন আমি আপনার জন্যে আছি।' বলেই দোকানের দিকে ফিরে ডাকল, 'এ গেনুয়া—'

আগে লক্ষ্য করে নি জয়ারা, সেদিনের সেই ছোকরাটা দোকানের ভেতরে বসে বিড়ি বাঁধছিল। সে ওখান থেকেই সাড়া দিল, 'হাঁ—'

'তুই সামনে এসে বোস্। আমি দিদিজিদের সঙ্গে একটা কাজে যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি, দোকান সামলা।'

'হাঁ।'

স্টেশনের ওধারে মিউনিসিপ্যালিটি একটা নতুন পার্ক করে দিয়েছে। রেল লাইনের ওপরকার ওভারব্রিজ পেরিয়ে ধনপত জয়াদের নিয়ে পার্কটায় চলে গেল।

পার্কে প্রচুর গাছপালা, সবুজ ঘাসের জমি, ফাঁকে ফাঁকে সিমেন্টের লাল-নীল ছাতা বানিয়ে সেগুলোর তলায় বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একধারে বাচ্চাদের জন্য দোলনা, নাগরদোলা, ছোট সুইমিং পুল। পার্কটাকে আলোকিত করার জন্য প্রচুর ফ্লুয়োরেসেণ্ট আলো দেওয়া হয়েছে।

সন্ধ্যের পর এই সময়টা পার্কে লোকজন তেমন নেই। বাচ্চাদের দিকটায় কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ওরা তিনজনে একটা লাল সিমেন্টের ছাতার তলায় গিয়ে বসল।

ধনপত বলল, 'এখানে অসুবিধা হলে আমার কোঠিতে নিয়ে যেতে পারি।'

জয়া বলল, 'জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। এখানে অসুবিধা হবে না।' কোনরকম ভণিতা না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এল সে, 'শুনেছি, আপনি আমার বাবাকে সম্মান করতেন।'

'হাঁ হাঁ, এত্তে বড়ে আদমী চৌধুরীজি! সম্মান করব না!'

'আপনি জানেন কীভাবে তাঁকে খুন করা হয়েছে। খুনীরা শাস্তি পাক, নিশ্চয়ই তা চান?'

'জরুর। হত্যারাগুলোকে সড়কের কুত্তা দিয়ে খাওয়াতে পারলে আমার আত্মার শান্তি হয়।' সাদাসিধে সরল ভালোমানুষ ধনপতের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, চোখ থেকে আগুন ছুটতে লাগল যেন।

জয়া বলল, 'এক মাস হয়ে গেল, পুলিশ এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারে নি। আমি কিন্তু খুনীদের ছাড়ব না।' একটু থেমে বলল, 'এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য খুব দরকার।'

ধনপত কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে রইল তারপর যা বলল তা এইরকম: তার মতো একজন সামান্য লোক কীভাবে সাহায্য করতে পারে, ভেবে পাচ্ছে না।

জয়া চাপা গলায় এবার বলল, 'আমার বাবা ডায়েরিতে আপনার কথা লিখে রেখে গেছেন।'

ভয়ানক হকচকিয়ে গেল ধনপত, 'কী লিখেছেন চৌধুরীজি?'

'ভানুপ্রতাপজিকে কারা খুন করেছে, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন। তাদের নাম জানতে পারলেই আমার যথেষ্ট সাহায্য হবে।'

চমকে চারদিক একবার দেখে নিল ধনপত। তারপর কণ্ঠস্বর অনেক নামিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আমি বহুত গরীব আদমী বহেনজি। আমি যা জানি তা রটে গেলে জানে খতম হয়ে যাব।'

ঠিক এ জাতীয় কথা অটোওলা মুঙ্গিলালও বলেছিল। ধনপতকে যথেষ্ট সাহস এবং ভরসা দিয়ে জয়া বলল, 'আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি যা বলবেন, আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না।'

'লেকেন—'

'কী?'

'ভানুপ্রতাপজিকে যারা খুন করেছে তাদের সঙ্গে চৌধুরীজির খুনের

সম্পর্ক কী ?'

'কিছু একটা আছে।'

অনেকক্ষণ দিধান্বিতের মতো বসে রইল ধনপত। তারপর মনের সবটুকু সাহস একসঙ্গে জড়ো করে বলল, 'ভানুপ্রতাপজিকে খুন করেছে চুন্না। বাঁয়া হাতে বন্দুক চালায় সে।'

অর্থাৎ ভানুপ্রতাপ এবং মহীতোষ, দু'জনের হত্যাকারী একই লোক। জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন খুন করেছে বলতে পারেন ?'

'না।' ধনপত জানালো, চুন্না পেশাদারী খুনী। দু-পাঁচ শো টাকা পেলে সে হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ভানুপ্রতাপকে তাক করে বন্দুক সে হয়ত চালিয়েছে কিন্তু তার পেছনে রয়েছে অন্য লোক।

'কে থাকতে পারে তার পেছনে ?'

ফ্লুয়োরেসেণ্ট আলোয় দেখা গেল গলগল করে ঘামছে ধনপত। কাঁপা গলায় সে বলল, 'শুনা হ্যায়, শুনা হ্যায়—' কথাটা শেষ না করে বলতে লাগল, 'যার কথা শুনেছি গলা দিয়ে তার নাম বার করলে আর সে যদি তা জানতে পারে, দুনিয়ায় এক রোজও আমি জিন্দা থাকব না।'

'আপনাকে ত কথা দিয়েছি, কেউ জানবে না।'

ভয়ে ভয়ে ধনপত বলল, 'চুন্না মগনলালের লোক। মগনলাল ওকে দিয়ে খুনখারাপি করায়।'

জয়া আর বিকাশ প্রায় আঁতকে উঠল। মগনলাল যে নকীপুরের মারাত্মক মাফিয়া কিং, সে যে এখানে বিশাল ক্রাইম ওয়ার্ল্ড তৈরি করেছে, সে একবার আঙুল তুললে রাস্তায় দশ বিশটা লাশ পড়ে যাবে, একথা এখানকার বাচ্চাও জানে। এতদিনে মহীতোষ এবং ভানুপ্রতাপের খুনের একটা কারণ আবছাভাবে যেন ধরা যাচ্ছে।

জয়া বলল, 'অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলাম। আপনাকে আর আটকাবো না। আজ চলি, পরে আবার দেখা হবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

ধনপতও উঠে পড়েছিল। চিন্তিত উদ্বিগ্নমুখে সে বলল, 'বহুত

হোঁশিয়ার রহেনজি। মগনলাল খাতারনাক আদমী।'

'আমি জানি।'

'আমার কথাটা মনে রাখবেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

পার্ক থেকে তিনজন বেরিয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে চলল।

ধনপতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। অনেক তাড়াহুড়ো করেও সাড়ে ন'টার আগে বাড়ি পৌছুনো গেল না।

বিকাশ এবং জয়া দু'জনেই একটু হতাশ হল। বিকাশ বলল, 'অনুপ নিশ্চয়ই ন'টায় ফোন করেছিল। আমাদের না পেয়ে লাইন ছেড়ে দিয়েছে।'

জয়া বলল, 'আজ ধনপতের কাছ থেকে এত বড় ইমপর্টাণ্ট একটা খবর পাওয়া গেল, অনুপকে জানানো দরকার।'

'ওকে ফোন করবে?'

কিন্তু অনুপ বলেছিল, 'ও নিজেই রাত ন'টায় ফোন করবে। আমরা ফোন করলে যদি—'

জয়ার কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে উঠল। টেলিফোন তুলে কানে লাগিয়ে, জয়া 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে অনুপের গলা ভেসে এল।

'কী ব্যাপার, ন'টার সময় ফোন করলাম। আপনারা বাড়ি ছিলেন না ত।'

জয়া বলল, 'আমরা ধনপত ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। ফিরতে দেরি হয়ে গেল। ফোন করে ভাল করেছেন। আপনাকে কিছু জরুরি খবর দেবার আছে।'

'কী খবর? ধনপতের কাছ থেকে কোন ক্লু বার করা গেছে?' অনুপের গলায় গভীর আগ্রহ।

ধনপতের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব বলে গেল জয়া, একটি শব্দও বাদ দিল না।

শোনার পর তীব্র চাপা গলায় অনুপ বলল, 'মগনালালের কথা বলেছে ধনপত। আপনারা ঠিক শুনেছেন?'

'নিশ্চয়ই। তার ভয়েস আমরা টেপ করে নিয়েছি।'

'ভেরি গুড।' কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল, অনুপ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'মগনলালের সঙ্গে বাবার খুনের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।'

'প্লীজ এ ব্যাপারটা এখন জানতে চাইবেন না।'

এর আগেও মহীতোষের হত্যাকারীদের বিষয়ে প্রশ্ন করে পরিষ্কার কোন উত্তর পায় নি। অনুপ যেন অত্যন্ত জটিল এক গোলকধাঁধার মাঝখানে তাকে এবং বিকাশকে ছুঁড়ে দিয়েছে। তারা অনবরত তার ভেতর পাক খেয়ে চলেছে। তাদের হাতে-পায়ে পুতুলনাচের পুতুলের মতো কোন অদৃশ্য সুতো বাঁধা আছে। চল্লিশ মাইল দূরে রহস্যময় খেলোয়াড়ের মতো অনুপ সেই সুতো টেনে চলেছে।

জয়া বলল, 'ঠিক আছে, জানতে চাইব না।'

তার কণ্ঠস্বরে যে সামান্য ক্ষোভ ফুটে বেরিয়েছে সেটা হয়ত কানে লাগল অনুপের। সে বলে, 'প্লীজ রাগ করবেন না। এখন ওই ব্যাপারে কিছু বললে আপনাদের আর আমার এতদিনের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর দু-একটা উইক ওয়েট করুন, সব জানতে পারবেন।'

জয়া এ নিয়ে জোরজার করল না। শুধু বলল, 'এবার আমাদের কী করতে হবে বলুন।'

'আপাতত কিছু না। পরে দরকার হলে জানাবো।'

অনুপের সঙ্গে কথা বলে জয়া ফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার সেটা বেজে উঠল। এবার একটা মোটা ধরনের গলা কানে

এল, 'হ্যালো, আমি জয়া বহেনজির সঙ্গে কথা বলতে চাই।' গলাটা পরিচিত নয়, আবার ঠিক অচেনাও মনে হচ্ছে না।

জয়া একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি জয়া। আপনি কে বলছেন?'

'নমস্তে বহেনজি।'

'নমস্কার।'

লোকটা অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, 'দেবার মতো পরিচয় আমার নেই। আমি ছোটামোটা আদমী।'

স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল জয়ার। এ গলা তার অচেনা নয়, সামনে বসে এই কণ্ঠস্বর সে শুনেছে। লোকটা যে মনসুখ তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। চোখের ইশারায় বিকাশকে কাছে ডেকে টেপ চালিয়ে মনসুখের গলা রেকর্ড করে রাখতে বলল জয়া। তারপর ফোনে মুখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জন্যে কী করতে পারি?' বলে ফোনটা টেপ রেকর্ডারের কাছে নিয়ে এল। নিজের কানও কাছাকাছি রাখল যাতে ভয়েসটা ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও তা শুনতে পায়।

মনসুখ জানালো, বাজে ধানাই পানাই না করে সে গোড়াতেই আসল কথা বলতে চায়। 'বহেনজি চৌধুরীজির মার্ডারের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আপনারা ক'দিন ধরে নানা জায়গায় ঘুরছেন। এটা করবেন না।'

আগের প্রক্রিয়ায় মনসুখের গলা টেপ করতে করতে জয়া চমকে উঠল। তাদের গতিবিধির ওপর তা হলে ওরা নজর রেখেছে। মনসুখকে যে চিনতে পেরেছে, তার বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে সে বলল, 'আপনি কি চান না, বাবার খুনীরা ধরা পড়ুক।'

'হাজার বার চাই। লেকেন ওটা কোন মহিলার কাজ না। তার জন্যে পুলিশ আছে, 'গরমিন' আছে। ওই খুনীরা বহোত খতারনাক আদমী।'

জয়া উত্তর দিল না।

মনসুখ আবার বলল, 'চৌধুরীজিকেও হোঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলাম, ভানুপ্রতাপজির মার্ডার কেসে সাক্ষি দিতে যাবেন না। উনি ছোটমোটা আদমীর কথা শুনলেন না। তাতে আমাদের দেশের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল ভাবুন। আমি চাই না আপনাদের ফ্যামিলিতে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটুক।'

লোকটা ভাল ভাল কথা বলে যে তাকে শাসাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। জয়া বলল, 'আপনার কথা ভেবে দেখব।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই বহেনজি। আমার অনুরোধ, ছোটামোটা আদমীর কথাটা আপনি রাখবেন।' বলেই লাইন কেটে দিল মনসুখ।

বিকাশের সঙ্গে এই অনুরোধ বা শাসানির ব্যাপারে পরামর্শ করে পাঁচ মিনিট পর রামপুরে ফোন করল জয়া। সব শুনে অনুপ বলল, 'ফাইন। মনসুখের গলার টেপ সাবধানে রাখবেন।'

পনের

এরপর দিন ছয়েক ঘটনাহীন কেটে গেল। দু-তিনদিন ছুটি নেবার পর আবার নিয়মিত অফিসে যেতে শুরু করেছে বিকাশ। তবে জয়া বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোয় না, সারাদিনই সে প্রভাবতীকে সামলায়। লোকজনের ভিড় আগের মতো না হলেও রোজ দু-চারজন আসেই। তাদের সঙ্গে জয়াকেই কথা বলতে হয়।

এর মধ্যে শর্মা এসে একদিন খোঁজখবর নিয়ে গেছে। আর একদিন এসেছিলেন গিরধরলাল, প্রভাবতীর কাছে প্রায় সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা তাঁর কুষ্ঠাশ্রমে ফিরে গেছেন।

তবে সপ্তম দিন ভোরে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে নকীপুরে। ধনপত ঠাকুর যখন স্টেশনের ওভারব্রিজ পেরিয়ে তার পান সিগ্রারেটের দোকানের দিকে আসছিল, কারা যেন বন্দুকের গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। রক্তাক্ত বেহুঁশ অবস্থায় সে পড়ে ছিল। কোলিয়ারির ক'জন ওয়ার্কার ডিউটিতে যাবার সময় তাকে দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান ডাকিয়ে এনে ধনপতকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দিনটা ছিল রবিবার। জয়ারা খবরটা পেয়েছিল দুপুরে। পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যায়। সেখানে তখন প্রচুর ভিড়। অগুনতি আর্মড পুলিস, এস. পি মেহের সিং, শর্মা এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা ত ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল ছোটবড় নানা পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা। এদের মধ্যে বিশেষ করে চোখে পড়ছিল রামনেহাল এবং হরকিষণকে।

সবাই ভীষণ উদ্বিগ্ন। যেভাবে নকীপুরে আইন শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে চলেছে তাতে মানুষের জীবনের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা নেই। চাপা গলায় মেহের সিং-এর সঙ্গে এই জাতীয় আলোচনা করেছিলেন রাজনৈতিক নেতারা। জয়ারা ওদিকে গেল না, ডাক্তারদের কাছে খোঁজখবর

নিয়ে জানতে পারল, তখনও মারা যায় নি ধনপত। তার গায়ে চারটে গুলি লেগেছে। ডাক্তাররা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, তবে সে বাঁচবে কিনা বাহাত্তর ঘণ্টা আগে জোর দিয়ে কিছুই বলা যাবে না।

সেদিন রাত্তিরে ফোনে বিকাশ যখন ধনপতের ব্যাপারটা বলতে শুরু করল, তাকে থামিয়ে অনুপ জানালো, আগেই সে খবরটা পেয়েছে। তারপর বলল, 'আপনাদের ওভাবে হাসপাতালে যাওয়া ঠিক হয় নি।'

গলার স্বরে বোঝা গিয়েছিল, খুবই বিরক্ত হয়েছে অনুপ।

চমকে উঠে বিকাশ বলেছিল, 'আমাদের সঙ্গে কথা বলবার পর ধনপতকে গুলি মারা হল। খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেদের। তাই—'

অনুপ বলল, 'ঠিক আছে, আর যাবেন না। মনে রাখবেন, বন্দুকের নল আপনাদের দিকেও তাক করা আছে।'

ধনপত হাসপাতালে ভর্তি হবার পর দিন চারেক কেটে গেছে। এর মধ্যে জয়ারা আর তার খবর নিতে যায় নি। অবশ্য সে কেমন আছে, চল্লিশ মাইল দূর থেকে রোজই অনুপ তা জানিয়ে যাচ্ছে। কাল রাত্তিরে অনুপ জানিয়েছিল, ঠিক তিন দিন বাদে গত কালই ধনপতের জ্ঞান ফিরেছে। তবে কথা বলার মতো শক্তি এখনও হয় নি। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে সে। ডাক্তাররা তার কাছে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। ধনপতের ওপর আবার নতুন করে হামলা হতে পারে, এই আশঙ্কায় কুড়িজন পুলিশ পালা করে দিন রাত হাসপাতালে পাহারা দিচ্ছে। এই কুড়ি জনের মধ্যে চারজন শর্মার লোক, মানে অনুপের লোক।

যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় বিকাশ এবং জয়ার একটা নিমন্ত্রণ আছে। ওদের ছেলেবেলার বন্ধু শোভনের বিয়ে হয়েছে পরশু দিন। আজ 'হোটেল মেরিগোল্ডে' রিসেপসান। নিমন্ত্রণটা সেখানেই। বিয়ের দিন

জয়ারা যেতে পারে নি, তাই কাল এসে প্রচুর চেঁচামেচি এবং মান অভিমান করে গেছে শোভন। মহীতোষ খুন হবার পর থেকে যা সব ঘটে চলেছে তাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে আনন্দ টানন্দ করার মতো মানসিক অবস্থা তাদের নয়। কিন্তু শোভনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভেবে আজ 'হোটেলে মেরিগোল্ডে' না গেলেই নয়। তা ছাড়া এই নিমন্ত্রণের সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে। বিকাশ ফটোগ্রাফার বলে রিসেপসানের সব ছবি তাকে তুলে দিতে হবে।

কাল রাত্রেই নিমন্ত্রণের কথাটা অনুপকে জানিয়েছিল বিকাশ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুপ বলেছে, 'ঠিক আছে, যান। তবে বেশি রাত করবেন না। হোটেল থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবেন, অন্য কোথাও যাবেন না।'

সন্ধ্যের একটু আগে আগেই জয়া এবং বিকাশ বেরিয়ে পড়ল। বিকাশের কাঁধে তার ক্যামেরাটা ঝুলছে।

চক বাজারের কাছে একটা বড় দোকান থেকে নতুন বৌকে উপহার দেবার জন্য দামী শাড়ি কিনে হোটেলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাতটা বেজে গেল।

'হোটেল মেরিগোল্ড' নকীপুরের সব চাইতে বড় হোটেল। দোতলায় উঠলে পর পর তিনটে ব্যাঙ্কোয়েট হল। এক নম্বর এবং দু নম্বরটা মোটামুটি মাঝারি মাপের কিন্তু তিন নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হলটা প্রকাণ্ড।

এক নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হলটা ভাড়া নিয়েছে শোভনরা। ফুল এবং আলো টালো দিয়ে চমৎকার সাজানো হয়েছে সেটা। দু নম্বর হলটা অন্ধকার, সেখানে আজ কোন অনুষ্ঠান নেই কিন্তু তিন নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হল-এর দিকে তাকালে চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যায়। অজস্র রঙের আলো, দামী দামী গোলাপ, রজনীগন্ধা, যুঁই, দেবদারু ও ঝাউপাতা, অভ্র, রেশমী কাপড়, এবং চুমকি দিয়ে নাম-করা ডেকরেটর সেটা সাজিয়েছে। প্রচুর দামী সেন্ট এবং গোলাপ-জল ছড়ানো হয়েছে। তার

উগ্র মিষ্টি গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। আজ ওখানেও একটা জমকালো অনুষ্ঠান আছে।

দোতলায় উঠে এক নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হল-এর দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়া আর বিকাশ। তিন নম্বর হল-এর গেটের সামনে বেশ ভিড়। তবু তারই মধ্যে চুস্ত, নাগরা, চিকনের কাজ-করা সিল্কের পাঞ্জাবী এবং ধবধবে সাদা পাগড়ি-পরা মধ্যবয়সী একটি ভদ্রলোকের দিকেই নজরটা বেশি করে পড়ে। টান টান চেহারা তাঁর, হাইট ছ ফুটের মতো, খাড়া নাক। রংটা অবশ্য কালোই। তাঁর মাথায় ধবধবে মিহি কাপড়ের কুঁচনো পাগড়ি, গলায় সরু সোনার হার, আঙুলে হীরে-মুক্তো এবং পান্নার আংটি।

ভদ্রলোককে আগে কখনো ছাখে নি জয়ারা। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল সেই মনসুখ একটা ট্রে-তে প্রচুর গোলাপ আর আতর নিয়ে মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর নিমন্ত্রিত কেউ এলেই ব্যস্তভাবে, আপ্যায়নের ভঙ্গিতে তার হাতে একটা গোলাপ নিয়ে গায়ে আতর ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মনসুখের মতো একটা বাজে লোকের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের সম্পর্ক কী, জয়ারা যখন বুঝবার চেষ্টা করছে সেই সময় অভাবনীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেল। দোতলায় উঠবার জন্য ছু'ধারে সিঁড়ি এবং লিফট রয়েছে। জয়ারা যেদিক দিয়ে উঠেছে তার উল্টোদিকের লিফট থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন হরকিষণ, সোজা তিন নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হল-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। মুহূর্তে ওখানে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য এবং ব্যস্ততা দেখা দিল। সেই ভদ্রলোকটি প্রায় ছুটে গিয়েই হরকিষণকে ছু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আইয়ে আইয়ে—' তারপর সেই অবস্থাতেই তাঁকে হল-এর ভেতরে নিয়ে গেলেন। বোঝা যায়, হরকিষণের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

জয়ারা অনেকটা দূরে থাকায় হরকিষণ বা মনসুখ তাদের দেখতে পায় নি। কিংবা এখানে যে তারা আসতে পারে, তা ভাবতে পারে নি।

তাদের লক্ষ্য বা মনোযোগ ছিল অন্য দিকে।

জয়ারা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ শোভনের গলা কানে এল, 'আরে আরে, তোমরা কী করছ এখানে! এসো এসো—' সে ছুটে এসে জয়া আর বিকাশের হাত ধরে এক নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হল-এর দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

যেতে যেতে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'তিন নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হল-এ কী হচ্ছে, জানো?'

'মগনলালের মেয়ের বিয়ে।'

বিকাশরা চকিত হয়ে উঠল, 'কোন মগনলাল?'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে শোভন বলল, 'নোটোরিয়াস মগনলাল। মাফিয়া—' কথাটা আর শেষ করল না সে।

মনসুখের সঙ্গে মগনলালের সম্পর্কটা এতক্ষণে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল কিন্তু এদের ভেতর হরকিষণ এলেন কি করে? মগনলালদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্রটা কী?

হল-এর ভেতর এসে নতুন বৌকে উপহার দিয়ে কিছু মজার কথা বলল জয়ারা। বিকাশ অনেক ছবি টবি তুলল কিন্তু দু'জনের সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ব্যাঙ্কোয়েট হল-এর ব্যাপারে টান টান হয়ে আছে।

বিকাশ হঠাৎ জয়াকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'মগনলাল, মনসুখ আর হরকিষণজির মধ্যে একটা আনহোলি কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে।'

জয়া বলল, 'আমারও মনে হচ্ছে।

'আমি একটা চান্স নেব।'

'মানে?'

'তিনজনকে একসঙ্গে ফোটোতে ধরতে চেষ্টা করব।'

জয়া চমকে উঠল, 'তা হলে তোমাকে তিন নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হল-এ যেতে হয়।'

বিকাশ বলল, 'যেতে ত হবেই।'

'এতে কিন্তু ভয়ানক রিস্ক।'

'রিস্ক একটু নিতেই হবে। মগনলালের মেয়ের যখন বিয়ে তখন অনেক ফোটোগ্রাফার ওখানে আছে। আমি তাদের মধ্যে মিশে যাব; তারপর সুবিধামতো শাটার টিপব।'

'ধরা পড়ে যাবে না ত?'

'যাতে না পড়ি, সে চেষ্টা করব।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।'

'ইমপসিবল। তুমি গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।'

চিন্তাগ্রস্তের মতো জয়া বলল, 'অনুপকে না জানিয়ে এভাবে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

বিকাশ বলল, 'অনুপকে জানাতে গেলে এ সুযোগ জীবনে আর কখনও পাব না।' বলে আর দাঁড়াল না, খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা বাদে যখন বিকাশ তিন নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে ফিরে এল, শ্বাসরুদ্ধের মতো জয়া একধারে দাঁড়িয়ে আছে।

বিকাশ বলল, 'সাকসেসফুল।' বলে একটু হাসল সে।

জয়া উত্তর দিল না, বুকের আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বার করে দিয়ে জোরে শ্বাস টানল।

হোটেল থেকে ফেরার পরই অনুপের ফোন এল। বিকাশ মগনলালের মেয়ের বিয়ে এবং ফোটো তোলার ব্যাপারটা জানাতেই সে লাফিয়ে উঠল, 'দুর্দান্ত কাণ্ড করেছেন, তবে রিস্কটা ভয়ানক বেশি নিয়ে ফেলেছিলেন।'

বিকাশ বলল, 'এ ছাড়া উপায় কী ছিল বলুন।'

'তা অবশ্য ঠিক। এখন ছবিটার অনেকগুলো প্রিন্ট করিয়ে রাখবেন।'

ষোল

ঠিক ছ দিন বাদে রাত্তিরে অনুপ এসে হাজির। তার সঙ্গে শর্মা। শর্মার হাতে একটা বড় ব্যাগ।

জয়ারা অনুপকে আশা করে নি। অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, আপনি!'

অনুপ বলল, 'বাধ্য হয়ে আসতে হল। আজ এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে আপনাদের পাটনায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'হোম সেক্রেটারির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁকে চৌধুরীজির খুনের ব্যাপারে কিছু ডকুমেন্ট দেখাব আর একটা টেপ শোনাব।'

'কিসের টেপ?

অনুপ শর্মাকে বলল, 'এঁদের শুনিয়ে দাও ত।'

শর্মা ব্যাগ থেকে টেপ রেকর্ডার বার করে চালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চেনা এবং একটা অচেনা গলা শোনা গেল।

'অনুপ সহায়কে রামপুরে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। চৌধুরীর মার্ডার কেসটা এবার চাপা পড়ে যাবে।'

'কিন্তু চৌধুরীর মেয়ে আর হোনেবালা দামাদ (জামাই) চারদিক এভিডেন্স খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'আপনার লোক দিয়ে ওদের শাসিয়ে দিন।'

'আর চুন্নাদের কী হবে?'

'আপাতত ওরা বোম্বেতে কি কলকাতায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকুক। এদিকের এক্সাইটমেন্ট কমে গেলে ফিরে আসবে।'

ছ'জনের কথার মাঝখানেই অনুপ শর্মাকে বলল, 'টেপ বন্ধ কর।'

জয়ারা স্তম্ভিত। একসময় বিকাশ বলল, 'একটা গলা হরকিষণজির। অন্যটা তো চিনতে পারলাম না।'

অনুপ বলল, 'ওটা মগনলালের।'

'ওদের গলা টেপ করলেন কী করে ?'

'আপনার কাছে ক্লু পেয়েই টেলিফোন ডিপার্টমেন্টের সাহায্য চাই। ওরা আড়ি পেতে টেপ করেছে।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

'হরকিষণজি মগনলালকে বাঁচাতে চাইছেন কেন ?'

'নিজের স্বার্থে। ইলেকসানের সময় প্রচুর পয়সা দেয় মগনলাল।'

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। কাকাবাবুর মার্ডারারদের ধরার জন্য নকীপুর তোলপাড় করে ফেলেছেন হরকিষণজি। এদিকে—'

'ওটা চোখে ধুলো দেবার জন্যে।'

'আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'মগনলালের লোকেরা ভানুপ্রতাপজিকে খুন করল কেন? ওই রকম ভদ্র নিরীহ মানুষ—'

'ভানুপ্রতাপজি মগনলালের কিছু গোপন বে-আইনি অ্যাক্টিভিটির খবর জেনেছিল। তাই প্রাণ দিতে হয়েছে। ভানুপ্রতাপজির বেঁচে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ না।' অনুপ বলতে লাগল, 'আপনাদের এখানে আসার আগে হাসপাতালে ধনপতের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। সে এখন কথা বলতে পারছে। যারা তাকে গুলি করেছে, ধনপতি তাদের চেনে। ওরা মগনলালের ভাড়াটে খুনী। ধনপত কথা দিয়েছে, কোর্টে গিয়ে তাদের নাম বলবে।'

'তবু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।'

'কী ?'

'শেষ পর্যন্ত এই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকেদের গায়ে কি হাত দেওয়া

যাবে ?'

'হোম সেক্রেটারি আর হোম মিনিস্টার দু'জনেই খুব স্ট্রিক্ট আর অনেস্ট। হোম সেক্রেটারি কথা দিয়েছেন, এভিডেন্সগুলো সলিড আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে পাটনা থেকে স্পেশাল ফোর্স পাঠিয়ে দেবেন। তারাই যা করার করবে। এখন আপনাদের টেপ, ফোটো—সব গুছিয়ে নিন।'

এক ঘণ্টা পর অনুপের জীপ জয়াদের নিয়ে পাটনার দিকে ছুটল।